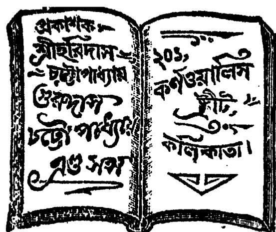
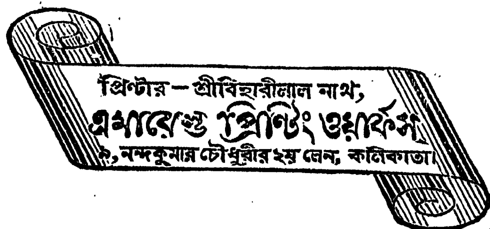
বৈরাগ-যোগ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।


প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২৬—পৌষ


প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

এই বইখানির ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে বলিয়া যখন আমার ডাক' পড়িয়াছে, তখন কিছু না লিখিলে নানা লোকের নানা কথা মনে হইতে পারে। মানুষকে অযথা কিছু মনে করিতে দেওয়া নিশ্চয়ই ভাল নয়।

বৎসরখানেক অতীত হইয়াছে, একদিন কল্পনা-লোকের এই নূতন চরিত্রগুলি লইয়া আমার আনন্দে দিন কাটিতেছিল। সেই আনন্দটুকু নিজে সর্ব্বগ্রাস না করিয়া যে অপরকে কিছু কিছু দিতে পারিয়াছি তাহার জন্য ঠিক কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের জাল ছিঁড়িয়া হয়ত কোন দিনই আমি গ্রন্থকার রূপে বাহিরে আসিতে পারিতাম না, যদি আমার বন্ধুবর্গ আমাকে তাঁহাদের উপরোধ অনুরোধের স্নেহময় পীড়নে পীড়িত করিয়া না তুলিতেন।

"বৈরাগ-যোগ" নিশ্চয়ই কোন যোগ-বিদ্যার পুস্তক নহে। ইহা হইতে মানুষ কিছু শিখিতে পারে কিনা, জানিনা। ইহাতে মনুষ্য-জীবনের কয়েকটি উপলব্ধি নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেগুলি কল্পনার কারখানা হইতে আমদানি করা হয় নাই বলিয়া, মনে হয়—অনেকের জীবনের সত্যের সহিত মিলিবে।

এই পুস্তকখানির জন্মের ইতিহাসের সহিত আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু জড়িত। তিনি খড় বাঁধা হইতে চাল-চিত্র পর্য্যন্ত সব কাজেই আমার সহায়রূপে ছিলেন; তাই বিশেষ ভাবে তিনি আজ আমার ধন্যবাদের পাত্র।

ভাগলপুর,
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩২৬

গ্রন্থকার।

বৈরাগ-যোগ

১

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তখন আমাদের মঠের কর্তা। সে অনেক দিনের কথা ; কিন্তু আজো তাঁকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

উন্নত গৌরবর্ণ দেহ—প্রশস্ত সুন্দর কপালের উপর কাঁচা-পাকা এক-রাশ চুল। চোক দুটো অসম্ভব রকম উজ্জ্বল,—দেখ্‌লেই মনে হয় প্রতিভা ফুটে বার হচ্ছে। কপালে বয়সের একটি দাগও পড়েনি। মুখে সব সময়ে ক্ষমার হাসি লেগে রয়েছে!

তাঁর রাগ আমরা দেখিনি ; রাগের কিছু কারণ ঘট্‌লে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি হাস্‌তে থাক্‌তেন।

জন পঁচিশেক ব্রহ্মচারী আমরা মঠে থাক্‌তুম্‌। আমাদের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ ছিল ; তিনি আমাদের—বাপ যেমন করে ছেলেকে ভাল-বাসে, তেম্‌নি ভালবাস্‌তেন। কিন্তু এই স্নেহ-ভালবাসা একদিনের জন্যও শাসনের কঠোরতাকে শিথিল করেনি।

আমাদের মঠের উদ্দেশ্য ছিল লোক-সেবা। এই কাজের যোগ্য হবার জন্যে আমাদের সাধন কর্‌তে হত। তারি উপদেশ স্বামীজি আমাদের দিনে-রাতে, অবসরে-অনবসরে এমন করে দিতেন যে, এক

দিকে আমরা যেমন নির্ভীক হয়ে উঠ্‌ছিলাম—অপর দিকে আমাদের ত্যাগ আর ক্ষমার সীমা-পরিসীমা ছিল না।

অতি প্রত্যুষে বৈদিক ব্রহ্মচারীর নিয়মানুযায়ী আমরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে ব্রহ্ম-চিন্তায় চিত্ত-নিবেশ কর্‌তাম। তপ, জপ, বেদগানে আমাদের আশ্রমটি মুখরিত হয়ে উঠ্‌ত। ওঁকার ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জনের মত আমাদের চিত্ত-শতদলকে বিকচ করে তুল্‌ত।

স্বামীজি শেষরাত্রে উঠ্‌তেন; তাঁর ভজন-পূজনের বিধি-নিয়ম একেবারে স্বতন্ত্র ছিল। এক-এক দিন তিনি এমন গভীর ধ্যান-নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে, সমস্ত দিন আর তাঁর সাড়া-শব্দ থাকৃত না। নিবাত নিষ্কম্প দীপের শিখাটির মত তাঁর দেহটি যেন উর্দ্ধের দিকে কিসের অন্বেষণে সে দিনের জন্যে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌ত। আমরা আর সে ঘরে যেতাম না; বাইরে বাইরে নিজেদের কর্ত্তব্য কর্‌তে থাকৃতাম।

বর্ষার শেষে—বোধ হয় শরতের ঠিক্ আরম্ভেই, একদিন স্বামীজি তাঁর ধ্যান-ঘর থেকে বার হলেন না। আমরা নিয়মমত সপ্তপর্ণির তলায় বসে সাম-গান জুড়ে দিলাম। পরিষ্কার নীল আকাশ—সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।—পাখীর গান আর আমাদের বেদ-গাথায় যেন মনে হল যে, মহাব্যোমের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের গা শিউরে-শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে দিন স্বামীজি ধ্যান থেকে আর উঠ্‌তেন না—সে দিন আমাদের ঠিক্ এমনিই হত। সে দিন যেন আকাশে—বাতাসে—আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে আমরা কি এক অভিনব সত্তার উপলব্ধিতে তন্ময় হয়ে যেতাম; যেন কিসের প্রতীক্ষায় আমাদের মন-প্রাণ স্তম্ভিত হয়ে আস্‌ত।

অপরাহ্নে আম্‌লকি-তলার বেদীর উপর বসে' আমরা পুরাণচর্চ্চা

করছিলাম। কেমন করে জড়-ভরত তাঁর হরিণের অন্বেষণে ছুটেছিলেন। সে ছোটাকে বাধা দেবে কে? নদ-নদী, পর্ব্বত, বন কিছুরই বাধা মানে না, যখন মন ছুটে চলে। কি অপূর্ব্ব এই চলা। তেমনি করে ছুটে যাবার সাধ আমার মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছিল।

সমস্ত দিন কড়া রৌদ্রের পর একটু হাওয়া উঠ্‌বার উপক্রম করছে। হঠাৎ পূবের আকাশে নজর পড়ে গেল,—দেখ্‌লাম, অন্ধকারের মত একটা মেঘকে পিছনে করে, একটা উদ্দাম ঝড় তার ধূসর জটাজুট আকাশের দিকে-দিকে উড়িয়ে দিয়ে, তাণ্ডব নৃত্যে আমাদের দিকে ধেয়ে আস্‌চে। কাক, পাখী ভয়ে ছুটে পালাচ্চে। হঠাৎ গঙ্গার রং যেন আতঙ্কে শিটিয়ে ইস্‌পাতের মত হয়ে গেল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে গাছপালা জখম করে দিয়ে ঝড়টা উত্তর দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার পর হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মূষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। মনে হল, যেন এক দিনে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাবে।

আমরা মঠের তেতালার ঘরের প্রকাণ্ড আলোটা জোরে জ্বালিয়ে গঙ্গার বুকের উপর ফেলে-ফেলে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম,—যদি কোন নৌকা বিপদে পড়ে থাকে। এমন অনেক দিন হয়েছে যে, আমরা কত ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করে এনেছি।

তখনি রাত-জাগবার পালা ঠিক্ হয়ে গেল। দু'জন করে ব্রহ্মচারী এমন দুর্দ্দিনে সেই ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বসে থাক্‌বে। অন্ধকার ও বৃষ্টিতে চারি দিক্ ঝাপ্‌সা দেখাতে লাগ্‌ল। বিপদের ঘণ্টা ঢং ঢং করে সমস্ত রাত মঠের উঁচু চূড়ার উপর থেকে বাজ্‌তে লাগ্‌লো। আলো আর আওয়াজে যদি কেউ বেঁচে যায়।

২

প্রাতে স্নান করতে গিয়ে স্বামীজি আমাদের সকলকে ডেকে উঠালেন। গিয়ে দেখি এক অচিন্তনীয় ব্যাপার!

বাঁধা ঘাটের পাশে যেন একটি কুমুদ ফুল দিনের আলোতে ঢলে পড়েছে! অপরূপ লাবণ্য সেই মেয়েটির—মাথার ঘন কাল চুলের রাশ কতকটা মাটিতে লুটোচ্ছে আর শেষের দিক্‌টা জলে ভাস্‌চে; গলা অবধি পাড়ে তুলে যেন সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সংজ্ঞা ছিল না।

স্বামীজি ঠিক্ অনুমান করেছিলেন—বল্লেন, একখানা কাপড় নিয়ে এস। নিশ্চয়ই ওর পরনে কাপড় নেই—তাই উপরে উঠ্‌তে পারেনি।

কাপড় জড়িয়ে ডাঙ্গায় তুলে পরীক্ষা করে আমরা দেখ্‌লাম যে, নাড়ী অতি ধিকিধিকি চল্‌চে;—কখনো বা চল্‌চে, আবার কখনো বা বন্ধ হচ্চে।

বেশী নাড়া-চাড়া কর্‌তে সাহস হল না—সেখানে কাঠ এনে আগুন জ্বেলে আমরা তাকে সেঁক দিতে লাগ্‌লাম। আমাদের হাতে ফোসকা উঠে পড়ল, কিন্তু মেয়েটির জ্ঞান আর সে দিন হল না।

সন্ধ্যার সময় সন্তর্পণে, ধীরে-ধীরে একটা খাটে শুইয়ে, মেয়েটিকে মঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।

সমস্ত রাত তার মাথার শিয়রে ব্রহ্মচারীরা জেগে সেবা কর্‌তে লাগ্‌ল। শেষ রাত্রে মেয়েটি চোখ চেয়ে একবার দেখ্‌লে। তার পর যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তার গা আগুনের মত তপ্ত হয়ে,

উঠ্‌ল। আর বিছানায় কিছুতেই থাকৃতে চায় না; বলে, 'ছেড়ে দাও, বাবার কাছে যাব।'

সকাল হতে-হতে ঘোর বিকার দেখা দিল। এই জল দাও, এই বাতাস কর—কিছুতেই স্বস্তি নেই। এমনি করে দিন কাটতে লাগল।

এমনি করে যে কতদিন কেটে গেল, ঠিক মনে নেই—খুব কম হলেও তিন মাস হবে। আমাদের তপ-জপের সঙ্গে চকিতার সেবাটা অঙ্গীভূত হয়ে গেল। ঐ নাম স্বামীজি মেয়েটিকে দিয়েছিলেন।

চকিতা সেরে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমাদের কম বিপদ দাঁড়াল না। সবাই মনে করেছিলাম যে, সে সেরে উঠে তার ঠিক্ ঠিকানা বল্‌তে পার্‌লে তাকে তার বাপের বাড়ী কি স্বামীর ঘরে রেখে আসা যাবে। কিন্তু ভীষণ ব্যায়রামে ভুগে তার পূর্ব্ব-স্মৃতি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হত, যেন সে সবে সে দিন আমাদের মঠেই জন্মেছে।

বনের হরিণীর মত তার সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ গতি। একদল ব্রহ্মচারীর মধ্যে সে যেন ঘন কাল মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত চম্‌কে বেড়াত। সকলেই তাকে ভালবাসত;—সবাই যে তাকে হাতে করে বাঁচিয়েছে!

স্বামীজি গম্ভীর মুখে তার চঞ্চলতা দেখ্‌তেন। সে সকাল-বেলা লম্বা চুল পা অবধি ঝুলিয়ে দিয়ে, ফুলের বনে সাজি হাতে করে ঢুকে পড়ত। সেখানে হয় ত ফুলের সঙ্গে সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে—নয় ত একটা প্রজাপতির পিছনে ঠিক্ তারই মত নেচে বেড়াচ্চে!

অনেক অনুসন্ধান হলো; কিন্তু চকিতার কোন আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। কাজেই মঠ তাকে আশ্রয় দিলে।

স্বামীজির স্নেহ এবং শাসনের বন্ধনে সে ক্রমেই আবদ্ধ হয়ে পড়্‌তে

লাগল। দেব-সেবার অসংখ্য কাজের ভার আস্তে-আস্তে তার কাঁধে স্বামীজি চাপিয়ে দিতে লাগলেন। তাকে পূজার ফুল তুলতে হতো, পুষ্পপাত্রে সেগুলিকে থরে থরে রংএর পর রং মিলিয়ে সাজিয়ে দিতে হতো; চন্দন ঘসা, দূর্ব্বা বাছা,—সাত-সতেরো কাজের বেড়ে তাকে এমনি জড়িয়ে ফেল্লে যে, সে আর ছাড়া পেত না।

কিন্তু তাকে ছাড়া দেখতে আমাদের বেশ ভাল লাগত। গুমটের মধ্যে হঠাৎ গাছের পাতা নড়িয়ে দমকা হাওয়া বয়ে গেলে যেমন ভাল লাগে—তেমনি ভাল লাগত তাকে—যখন সে আমাদের ধারাবাহিক কাজের মধ্যে উদ্দাম ভাবে এসে পড়ে সব ওলট-পালট করে দিত।

কিন্তু স্বামীজি সেটা যে পছন্দ করতেন না—তা বুঝতে পারা যেত তাঁর নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য্যে! এটা আমরা উপলব্ধি করতাম; কিন্তু চকিতা যে কিছু বুঝত বলে ত' আমার বোধ হয় না। এই মেয়েটি তখনো পুরুষ আর মেয়ের বিভিন্নতাই উপলব্ধি করতে পারে নি। কেন তাকে তফাৎ হতে হবে? একথা আমরাও ভাল করে বুঝতাম না; আর স্বামীজিও ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের খোলা-খুলি ব্যবহারে আর কিছু না থাক দম্ আট্‌কাবার ভয় থাকে না। খোলা কথা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে; কিন্তু তাতে ভিতরের সঞ্চিত বাষ্পে মনটাকে ফাটিয়ে দেবার সম্ভাবনা নেই। স্বামীজিকে আমরা খুব ভালবাসতুম,—তবুও এই চাপা ব্যবহারে আমাদের মধ্যে যে রাগ সঞ্চিত হচ্ছিল না—এমন কথা বলা যায় না।

চকিতার দেহে যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না; কিন্তু মনে সে নিতান্ত বালিকা ছিল। আমরা আহারে সংযম করতে শিখেছিলাম

—আচারে সমস্ত বিধি-নিষেধকে মান্‌তুম; কিন্তু সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সংসারের এই বৃহৎ সমস্যার কোন ধারই ধার্‌তাম না। স্বামীজি যে ছোট-খাট বাধা সৃজন কর্‌বার প্রয়াস পেতেন, তাতে বাঁধের মুখে নদীর গতির মত তা' দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ত!

এক দিন সকাল বেলায় হঠাৎ পরামর্শ-ঘরে আমাদের মধ্যে বাছা-বাছা জন কয়েকের ডাক্ পড়ল।

স্বামীজি প্রশস্ত ললাটখানি ঈষৎ কুঞ্চিত করে বসে ছিলেন। তাঁকে সেদিন ঠিক্ শীতকালের জলাশয়ের মত দেখাচ্ছিল। তাই দেখে আমাদের মনগুলো যেন শিটিয়ে গেল।

তিনি বল্‌লেন—"মঠের অতি দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে হলে, অন্ততঃ একজনকে সর্ব্বত্যাগী হতে হবে।"

আমরা অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বল্লেন, "ঠিক্ এমনি বিপদে একদিন বুদ্ধদেব পড়েছিলেন, যখন মেয়েরা এসে তাঁর শিষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জানালে। তিনি প্রথমে কিছুতেই রাজি হন নি।"

আমাদের ভিতর ব্রহ্মচারী চন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "আমার মনে হয়, বুদ্ধদেব অযথা ভয় পাচ্ছিলেন।"

স্বামীজি বল্‌লেন, "তাই যদি হয়ে থাকে, তবে তুমি বল্‌তে চাও যে, আমার এই ভয়টাও মিছে ভয়?"

চন্দ্রনাথ মাথা নীচু করে রইল। এখানে কথার উত্তর দেওয়াটা ঔদ্ধত্য হতো।

স্বামীজি বল্‌লেন, "আমি গোড়ায় তাই মনে করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় আমাদের মঠের কোন অমঙ্গল

হবে না। কিন্তু আর একটা কথা, সেই সঙ্গেসঙ্গেই আমার মনে হচ্চে ক'দিন থেকে। যে জিনিসটা আমাদের সাম্‌নে আজ উদ্যত হয়ে উঠেছে —তা' থেকে নিজেদের রক্ষা কর্‌বার বুদ্ধিও ত' তিনি দিয়েছেন। আমি যা' বলছি—তা' আরো পরিষ্কার, স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন হয়েছে।

"মনে কর, আমার হাতে যদি এমন একটা বিষাক্ত সাপ কামড়ায়—যাতে আমার হাতটাকে বাঁচাতে গেলে প্রাণ যেতে পারে;—সেখানে কি হাতটার মায়া ত্যাগ করে প্রাণটাকেই বাঁচান উচিত নয়?"

আমরা বল্লাম, "নিশ্চয়ই।"

"এই মঠ", তিনি বল্লেন, "যে উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা' মানুষের জীবনের সমগ্র মঙ্গলকে ধারণ করে উঠ্‌তেই পারে না। মানুষের আত্মা যেমন কোথাও গিয়ে শেষ হবে না—তার হিত চিন্তারও কোথাও শেষ সীমা নেই। কিন্তু এই সংসারটা,—আমাদের শক্তি সামর্থ্য সবই সসীম, তাই এখানে বৃহৎকে খর্ব্ব করে আন্‌তে হয়; কেবল তাকে আমাদের ক্ষুদ্র নাগালের গণ্ডীর ভিতর টেনে আন্‌বার জন্যেই!"

এই কঠিন তত্ত্ব চট্ করে আমাদের মাথার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে না দেখে, স্বামীজি খানিক চিন্তা ক'রে বল্লেন:—

"আমরা সকলে লোকহিত-ব্রত গ্রহণ করেছি। এই লোকহিত-ব্রত কি সংসারে থেকে বিবাহ করে করা চলত না? এখানে মতভেদ আছে। হয় ত কেউ বল্‌বেন, 'চলত'। কিন্তু আমরা মনে কর্‌ছি যে তা চলে না; তাই সংসার ত্যাগ করে এসেছি। সংসারে থাক্‌লে মানুষ নিজেকে নিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়ে যে, পরের চিন্তা আর সম্ভবপর হয় না। দুনিয়াতে এমন একদল লোক থাক্‌বে, যারা নিজের

কথা একটিবারও ভাব্‌বে না,—পরের মঙ্গলের কথাই তাদের মনে সর্ব্বদা জাগ্রত হয়ে থাক্‌বে। এই ত আমাদের উদ্দেশ্য। সংসার পাছে জড়িয়ে ফেলে—তাই সংসার থেকে এত দূরে আমরা; কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছাতে আজ যেন আমরা জড়িয়েই পড়চি! যে বিষ আমাদের ভারাক্রান্ত কর্‌চে, তাকে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যেতে না দিয়ে—কোন একটা অঙ্গের মধ্যে নিবদ্ধ রাখ্‌তে পার্‌লেই কি আমাদের ভাল হয় না?”

স্বামীজি আমাদের দিকে তাঁর প্রখর দু'টি জিজ্ঞাসু চোখ ফেলে উত্তরের প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

চন্দ্রনাথ এবার একটু উত্তেজিত হয়ে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল—“যুক্তি-তর্কের মধ্যে উপমার জাল ছড়িয়ে দিলে অনেক সময়ে ঈপ্সিত সত্যে উপস্থিত হওয়া যায় না। আপনি যাকে বিষ বল্‌চেন, তা বিষ নাও হতে পারে। আমার মনে হয়, সংসারে যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ দাঁড়িয়েছে, সেটা পুরুষের স্ত্রীজাতির উপর ক্ষমতার অপব্যবহারের ফল। সেটা পুরুষের স্বার্থপরতা—আমরা সন্ন্যাসীর দল, তার কি বহু ঊর্দ্ধে নয়?”

স্বামীজি তাঁর সেই অদ্ভুত হাসিটি প্রয়োগ করে চন্দ্রনাথের তর্কের সমস্ত উষ্মা এক পলে ঠাণ্ডা করে দিলেন।

“তা বটে চন্দ্রনাথ; কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা একটা মস্ত মূলধন—তাকে ভুল্‌লে চলে কই? তুমি যদি বল সাপের বিষ যে মারাত্মক,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার দেহে সেটা প্রমাণ হচ্চে,—ততক্ষণ স্বীকার কর্‌বে না, এমন বলার যে সৎ সাহস আছে, তাকে আমি খুবই সুখ্যাত করি—কিন্তু তোমার প্রাণটা কি এই ব্যাপারে আমি নষ্ট হতে দিতে

পারি ? এইখেনেই শাস্ত্রের মূল্য। শাস্ত্র অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কি ? আর, উপমার ভিতর কি কোন সত্য নেই ?

"একটা কথা আমার মনে পড়ল—এক দিন এক মূর্খের প্রসঙ্গে জেনেছিলুম যে তার মার খুব জ্বর হওয়াতে সে তাঁকে একটা টবের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিল। লোকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তখন সে হেসে বল্লে, সে ত খুব সহজ—যা গরম হয়, তাকে ত জল দিয়েই ঠাণ্ডা কর্‌তে হয়। সে বোধ হয় একখণ্ড লোহার কথা ভেবে বলেছিল। তার পর সেদিন চকিতার অসুখে ডাক্তার যখন তাকে এক টব জলে ডুবিয়ে রাখ্‌লে, তখন আমার সেই মূর্খকে আর মূর্খ বলে মনে হচ্ছিল না—তার উপর কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠ্‌ছিল।

"মোট কথা, আমাদের মঠ এত দিন যা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে এসেছে,—আজকে হঠাৎ তাকে বদ্‌লে দেবার আমি কোন প্রয়োজন দেখ্‌চিনে। ব্রহ্মচারী-জীবনের মধ্যে রমণীর কোন স্থান নাই।—কিন্তু এই নারীটিকে আমি অত্যন্ত অসহায় ভাবে সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিতেও পারিনে। তাই আমি ভাবৃচি যে, তোমাদের মধ্যে একজনকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ত্যাগ করে গার্হস্থ্য গ্রহণ কর্‌তে হবে। এই ত্যাগ-স্বীকার কর্‌তে কে প্রস্তুত আছ—আমি জান্‌তে চাই।"

স্বামীজির এই প্রস্তাব শুনে ত আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারুর মুখে একটি কথাও ফুটল না।

স্বামীজি চন্দ্রনাথকে আহ্বান করে বল্লেন—"চন্দ্রনাথ, তুমি প্রস্তুত নও চকিতাকে বিবাহ করে সংসার-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে ?"

"আপনার অনুজ্ঞা অবহেলা কর্‌তে পারিনে ; কিন্তু যদি আমার স্বাধীন মতামতের উপর এই জিনিসটাকে ছেড়ে দেন—তা'হলে বল্‌তে

পারি যে, ব্রহ্মচারীর জীবনকে আমি পবিত্রতর বলে মনে করি—গৃহী হ'তে আমার জীবনে কোন দিন সাধ হয় নি।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কাজ করে, এমন মত স্বামীজির ছিল না।

ব্রহ্মচারীরা কেউ সম্মত হল না।

স্বামীজি পনর দিনের জন্য মঠ ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। মঠের কর্তৃত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হলো।

৩

সেদিনকার তর্ক-বিতর্কের ফলে চন্দ্রনাথ অনেকখানি বিমনা হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখ্‌লেই স্পষ্ট বুঝা যেত যে, তার বুদ্ধির উপর যেন সমস্যার একটা সূক্ষ্ম পর্দা পড়ে গিয়েছিল—যেটাকে কিছুতেই সে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ছিল না।

সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করে সে একদিন গঙ্গার তীরে বাঁধা ঘাটের উপর চুপ্‌টি করে বসে ছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত; চাঁদের আলোতে পূবের আকাশ তখন ঈষৎ উজ্জ্বল—তারি ছায়া গঙ্গার বুকে পড়ে ঢেউয়ের মাথায় ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠ্‌ছিল।

চন্দ্রনাথের মন কিন্তু ঢেউয়ে ছিল না; পূবের আকাশে ছিল না; তাই আমি যখন তার পিঠের উপর আমার হাতখানি ধীরে ধীরে রেখেছিলাম, তখন সে শিউরে উঠেছিল—সেই শেওরানির সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার দেহের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উদ্দামতা স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম।

সে একটু রাগ করেই বল্লে, "এমন করে ভয় দেখান তোমার ভাই, ভারি অন্যায়।"

আমি বল্লাম "সত্যি কথা বল্‌বি? বল ত তুই কাকে মনে করেছিলি?"

চন্দ্রনাথ ইতস্ততঃ না করেই বল্লে, "চকিতাকে।"

"এমন অসম্ভব মনে হবার কি কারণ?"

"অসম্ভব মানে?"

"এ সময় চকিতা ত নীচে থাকে না।"

"কিন্তু তার নীচে আস্‌বার মানা ত নেই।"

"তা বটে, কিন্তু পথও ত খোলা নেই।"

চন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে বল্লে—"অত জানিনে—সে এমন মাঝে মাঝে এসেছে—তাই মনে হলো, তার আসা অসম্ভব নয়!"

"বটে, সে কথা আমি জানি নে।"

চন্দ্রনাথ নির্ব্বাক্ হয়ে বসে রইল। তাকে দেখে আমার স্তব্ধ নিশীথের কথা মনে হ'লো—নির্নিমেষ স্তব্ধতার নীচে ঝিল্লী-ধ্বনির কি ক্ষুব্ধতা! চন্দ্রনাথের চিন্তায় চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ দু'জনে স্তব্ধভাবে বসে রইলাম,—দেখি, কখন চাঁদ আকাশের পথে অনেকখানি উঠে পড়েচে। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে যাওয়াতে চন্দ্রনাথ বুঝ্‌তে পার্‌লে যে তার কথা না কওয়াটা ঠিক্ হচ্চে না।

কিন্তু কি কথা সে কইবে? বল্লে, "স্বামীজি কবে ফির্‌চেন?"

"আরো দিন পাঁচেক পরে।"

"তাই ত"...বলে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

'কেন ?"

'তাই বল্‌ছিলাম—তিনি ফিরলে আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই একটা কথা—"

"কি কথা ?"

"তিনি—আমাকেই কেন বিশেষ করে আহ্বান কর্‌লেন ?"

"ঠিক্‌, এ কথা আমাদের সকলেরই মনে নিয়েছে।"

"আচ্ছা—তুমি কিছু কারণ মনে কর্‌তে পার ?"

"হয় ত তিনি তোমাকে সব চেয়ে যোগ্য বলে মনে করেছেন।"

"ও-সব বাজে।"

"এই বিষয়ে যোগ্য হতে পার।"

"তার মানে কি ?"

"গৃহীর গুণ হয় ত তোমাতেই সব চেয়ে বেশী আছে।"

চন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, "তা নয়, স্বামীজি আমাকে সব চেয়ে অযোগ্য মনে করেছেন। এ যেন ঠিক্‌ তেমনি...ঐ কোন্‌ দেশের রুগ্ন ছেলেকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দেওয়া।"

আমি কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। সে বল্লে, "মঠের সব চেয়ে কম ক্ষতিতে সব-চেয়ে বড় লাভ হয়, যদি আমি রাজী হই। মঠের জন্য প্রাণ দিতেও আমি প্রস্তুত আছি; কিন্তু এমন করে নয়—এতে আত্মার অধোগতি হবে।"

"কেন ?"

"আমি মনে করি" চন্দ্রনাথ একটু হেসে বল্লে, "চকিতার সঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করাই যেতে পারে না। তার যে মনের অসামাজিক অবস্থা—স্বামীজির এইখানেই মস্ত ভুল হয়েছে। স্ত্রী এবং

পুরুষের মিলনের কারণ যদি প্রেম-ভালবাসা না হয়, তা'হলে সে মিলন সুখের হয় না—তাতে সমাজের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল বেশী হয়।—বিবাহ ব্যাপারটাকে কেবলমাত্র সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতিতে পর্য্যবসিত করে আমরা সমাজের এত ক্ষতি করেছি। মানুষের জীবনটাকে অমন করে বিধি-নিয়ম দিয়ে বেঁধে আড়ষ্ট করে দিলে—আর সবই তাতে থাকে, কেবল সে প্রাণহীন হয়ে পড়ে,—সে তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে,—স্বেচ্ছায় বেড়ে উঠ্‌বার আর অবসর পায় না। আমাদের সমাজের অধঃপতনের এই একটা মস্ত কারণ বলে আমার মনে হয়। নিয়মগুলোর দোষ যে, সেগুলো সমাজের বাড়ের সঙ্গে বেড়ে উঠ্‌তে পারে না। চীনাদের লোহার জুতোর মত সমস্ত সমাজকে খর্ব্ব ক'রে কুৎসিত করে দেয়। যে নিয়ম মানুষের স্বাধীনতাকে লোপ করে দেয়—সেই নিয়ম সমাজের কোন উপকার করে না—সে সমাজের অপকারই করে।

"চকিতাকে আমি যদি চাই ত' সে তার রূপের জন্যে ;—এ চাওয়া দেহের চাওয়া, মনের চাওয়া নয়। এমন করে কীট-পতঙ্গ জন্তু-জানওয়াররা চায় ;—এই চাওয়ার ফলে যা লাভ হয়—সে লাভের যোগ্য মানুষ নয়; মানুষকে আমি তার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করি ;—মানুষ যা' মন দিয়ে এবং তার বুদ্ধি দিয়ে চায়—সেইটেই তার আসল চাওয়া ;—তেমন করে তাকে না চাইতে শেখালে সে আসল জিনিষ পেতেই পারে না।

"স্ত্রী-পুরুষের মিলনের যোগ-সূত্র যদি কেবলমাত্র লালসা হয়, ত' তার ফলে আমরা মানুষ পাইনে—জানওয়ার পাই ;—এই কারণে আজকাল আমাদের দেশে মানুষের চেয়ে জানওয়ারের সংখ্যা এত বেশী হয়ে পড়চে।

বুঝ্‌লে ভাই, আমি বল্‌তে চাই—চকিতার বিবাহ হতেই পারে না—তার দেহের বিবাহের বয়স হয়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু তার মনের সে বয়স হয়নি!”

আমি বল্লাম, “তোমার এই তর্ক আরো একটু টেনে নিয়ে গিয়ে যদি বলি যে, আমাদের দেশের মেয়েদের যে বয়সে বিবাহ হয়—তাতে মনটা ত’ কাঁচাই থেকে যায়—কিন্তু বিয়ে কি বন্ধ থাক্‌চে তাই ব’লে?”

“বন্ধ থাক্‌চে না বটে—কিন্তু রাখা উচিত নিশ্চয়। যে মন শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট হয়ে ওঠেনি, তাকে অধিকার দিলেও সে অধিকার রাখ্‌তে পারে না। এই কারণেই আমরা নারীকে সম্মান করিনে। তারাও সম্মানের দাবী করে না। আমরা মনে করি তারা রিপু চরিতার্থ করবার উপায় মাত্র।”

চন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হচ্ছিল—সে উত্তেজিত হয়ে বল্লে—“এই বিবাহ ব্যাপারে আমার ঘোর আপত্তি আছে—আমি প্রাণ থাক্‌তে এ কিছুতেই ঘট্‌তে দেব না।”

তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল!

৪

স্বামীজি ফিরিলেন,—সঙ্গে তাঁর গুরুদেব। প্রকাণ্ড পিঙ্গল জটা, দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ সাদা, ধপ্‌ধবে। দেখেই মনে ভক্তি হয়। মনে হলো যেন কৈলাস ছেড়ে স্বয়ং সদাশিব নেমে এলেন!

তেতালার হল-ঘরে তিনি দুপুরটা কাটাতেন একটা প্রকাণ্ড হরিণের চামড়ার উপর বসে; কিন্তু রাত্রিবাস তিনি ঘরের মধ্যে কর্‌তেন না—কি শীত, কি গ্রীষ্ম—এই তাঁর নিয়ম।

আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম—তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন; বল্লেন, "এ ভেদ-জ্ঞান ব্রহ্মচারীদের থাকে, সন্ন্যাসীর থাকে না।"

তাঁর আসাতে মঠে যেন উৎসব পড়ে গেল। স্বামীজি বল্লেন, "যে ক'দিন গুরুদেব আছেন, সে ক'দিন তোমরা আপন আপন ইচ্ছায় চল—তোমাদের কোন নিয়ম পালন কর্‌তে হবে না।"

মেঠো রাস্তায় চাকায় কাটা গর্ত্তের পথ ছাড়া যেমন গরুর গাড়ী যেতে পারে না, তেমনটি ঠিক্ হয়ে পড়েছিল আমাদের; অনিয়মের উঁচু-নীচু উব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথে চল্‌বার সাধ্যই ছিল না। আমরা কতকটা বিপদেই পড়ে গেলাম; সমস্ত দিনটা কেমন করে কাটে।

একদিন দুপুরে তেতালার উত্তরের ঘরে বসে হঠাৎ আমার একটা পুরোণো অসম্পূর্ণ ছবিকে সম্পূর্ণ করে তোলবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসে, ইচ্ছাকে অবিলম্বে কাজে পরিণত কর্‌তে লাগ্‌লাম।

গায়ত্রীর ছবি আঁক্‌ছিলাম। চারিদিকে জল, মধ্যখানে একটা ছোট-পাহাড়ের উপর একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড় করিয়ে তার দৃষ্টিটা উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে নীল আকাশ ভেদ করে যেন কোথায় সংলগ্ন করে দিতে চাচ্ছিলাম। মুখখানা কতবার পুঁছ্‌লাম—কতবার আঁক্‌লাম; কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। সমস্ত দিন তার উপর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ছবিটা সে দিনের মত রেখে দিতে যাব, তখন অস্পষ্ট আলোতে পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলাম যে, আমি চকিতার মুখ এঁকেছি!

অদূরে স্বামীজি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার মনে হ'ল তাঁর চোখ দু'টো হাসিতে ভরা! সে হাসিতে দুষ্টুমি ছিল, আর প্রসন্নতা ছিল। তিনি বল্লেন, "জ্ঞানানন্দ, এত কম আলোতে ছবি এঁক না, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।" আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট্‌ করে রইলাম।

অনেক রাত পর্য্যন্ত চোখে ঘুম এল না; বিছানায় শুতে একেবারে ভাল লাগে না; আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জ্যোৎস্না ফুট্‌ফুট্‌ কর্‌চে। গভীর নিস্তব্ধতার উপর ঝিঁ ঝিঁ যেন শব্দের একটি সূক্ষ্ম রেখার আঁচড় অবিশ্রাম টেনে চলেচে। মনে হ'ল, তার আদি নেই, অন্ত নেই; মনে হ'ল সে শব্দও যেন অনন্তেরই যাত্রী! হঠাৎ আমার সমস্ত জীবনকে একটা বিরাট্‌ স্বপ্নের মত বোধ হলো।

এমন-সব অদ্ভুত কথা মনে হওয়াতে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে; খানিকটা গঙ্গার ঠাণ্ডা জল মাথায় দিতে ইচ্ছা হলো। ধীরে-ধীরে বাঁধা ঘাটের উপর গিয়ে দাঁড়াতেই দেখ্‌লাম, স্বামীজি আর তাঁর গুরুদেব। স্বামীজি গুরুর পদ-সেবা কর্‌চেন। তাঁরা যে সকল কথাবার্ত্তা কইছিলেন, তা' আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম।

গুরুদেব ব'ল্লেন, "ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল চূড়ান্ত ভাবে কিছুই বলা যায় না। ফলাফলের উপর মানুষের কর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণেই থাকে। মনে কর, আমার পরমায়ু জ্যোতিষ হয় ত বল্লে একশ' বছর; আমি কিন্তু আশীর বেশী বাঁচলাম না,—তা'হলে কি বল্‌তে হবে, গণনা ভুল? এখেনে বুঝ্‌তে হবে যে, আমার বাঁচার নির্দ্ধারণ ছিল একশ' বছরই; কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা আমি তাকে খাট করে ফেল্লাম। যাঁরা এই কাজে বহুদর্শিতা লাভ করেছেন, তাঁরা গণনার ভিতর এই কর্ম্মের প্রভাবটাও ধরেন। এই হিসেব বড় কঠিন!

"মেয়েটির হাত দেখে মনে হয়, তার বিবাহ এখনো হয়নি, খুব শীঘ্র হবে বলেও মনে হয় না; সন্নিকটে তার একটা ফাঁড়া আছে—সেটা উত্তীর্ণ হতে পারে কি না সন্দেহ;—গণনা ঐখানেই বন্ধ করেছি।"

"তাকে মঠে রাখার বিষয়ে কি বলেন?" স্বামীজি প্রশ্ন কর্‌লেন।

"মেয়েটির স্বভাব অত্যন্ত বিশুদ্ধ" গুরুদেব বল্লেন,—"আর ব্রহ্মচারীরাও সোনার চাঁদ—কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা কর্‌বার দরকার কি?"

"চকিতাকে নিয়ে কি করি, বুঝেই উঠ্‌তে পারি না। এ বিষয়ে আপনি কি উপদেশ দেন?" স্বামীজি প্রশ্ন কর্‌লেন।

উত্তরে গুরুদেব বল্লেন, "ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে এই কন্যাটির এই মঠে বসবাস মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, পরন্তু একান্তই বাধা স্বরূপ হবে বলেই মনে করি। ধ্যান ধারণা, ভগবৎ চিন্তার জন্যে চিত্তের যে ঐকান্তিকতার প্রয়োজন, মঠে নারীর বর্ত্তমানে তাতে সবিশেষ বিঘ্ন ঘট্‌বে বলেই বোধ হয়। এই সব ভেবে চিন্তে আমি বলি যে, মেয়েটিকে অন্যত্র পাঠাবার কেন ব্যবস্থা কর না!"

স্বামীজি বল্লেন, "তার চেষ্টা করেছি—এমন চেষ্টাও করেছিলাম যে,

ব্রহ্মচারীদের মধ্যে যদি কেউ তাকে বিয়ে করে গৃহী হয়। কিন্তু তাতেও কেউ সম্মত হয়নি। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তা' ত আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। এই সব চিন্তায় মনটা এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল যে, আপনার কাছে গিয়ে না পড়লে হয়ত' বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়তাম।"

স্বামীজি চুপ কর্‌লেন।

হঠাৎ মনে হলো, এমন করে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুন্‌বার আমার কোন অধিকার নাই; তাই ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে, স্বামীজির পায়ের তলায় বস্‌লাম।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "জ্ঞানানন্দ, তুমি যে এত রাত্র পর্য্যন্ত জেগে রয়েছ?"

স্বামীজির স্বরে যথেষ্ট স্নেহ মাখানো ছিল; কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল; লজ্জায় আমার সমস্ত মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সহসা কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না!

মাথার উপর দিয়ে একটা নিশাচর পাখী তীব্র ডাক ডেকে চলে গেল; অপদেবতাদের উপহাসের অট্টহাসির শাণিত ছুরিখানা মনে হলো যেন আকাশ থেকে আমার চিত্ত অবধি বিস্তৃত!

নির্ব্বাক্ দেখে স্বামীজি আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন লক্ষ জীবনের রাশি-রাশি কান্না উত্তুঙ্গ হয়ে উঠ্‌ল। মনে হল, যেন তারা আমার দেহের নবদ্বার ভেঙ্গে বার হবার জন্যে ভীষণ হানা-হানি কর্‌ছে। তারপর কি হলো মনে নেই।

৫

চকিতাকে মঠ থেকে সরিয়ে ফেলাই তাঁরা স্থির করলেন। আগুন নিয়ে খেলা করার দরকার কি? এ কথা যখন শুনলাম, তখন একটা মস্ত বড় আরামের নিশ্বাস ফেল্‌তে ভারি সাধ হলো। ফেল্‌তে গিয়ে দেখি, ফেলা যায় না—পাঁজরের নীচে কোথায় যেন একটা কাঁটার মত ব্যথা লেগে রয়েচে!

কিন্তু এ কথা কাউকে জান্‌তে দিলাম না। গায়ত্রীর ছবিখানা খুব করে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। মনের মধ্যের ছবিখানাকে—যার কথা আমারই ভাল করে জানা ছিল না—মঠের কাজ-কর্ম্ম, ধ্যান-ধারণার নির্ম্মাল্যের নীচে পূজা-প্রতিষ্ঠার ঘটের মত চাপা দিতে লাগ্‌লাম।

কাশী কি প্রয়াগে, অনাথ-আশ্রম, কি সেবাশ্রমে—ঠিক্ বল্‌তে পারিনে—ঐ রকম কি একটা নাম—চকিতাকে গুরুদেব নিয়ে চলে গেলেন। আমাদের ব্রহ্মচারীর পুরোণো জীবন আরম্ভ হয়ে গেল।

জলের উপর প্রতিবিম্বের পাকা ছাপ যেমন কিছুতেই পড়ে না—জিনিসটা সরে যাওয়া মাত্র যে-কে সেই, আমাদের মনটাও নিমেষে ধুয়ে-পুঁছে আবার তেমনি উজ্জ্বল চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌ল! আবার তেমনি করে পূবের আকাশে সূর্য্য উঠ্‌তে লাগ্‌লেন—তেমনি করে আমাদের বেদ-গাথায় আকাশ ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। আমরা আবার ফুল তুল্‌তে লাগ্‌লাম, মালা গাঁথ্‌তে বস্‌লাম। স্বামীজির মুখ থেকে বর্ষার মেঘের মত গাম্ভীর্য্য কেটে গিয়ে শরতের নীল, নির্ম্মল আকাশের প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠ্‌ল!

এক বছর পরে, গ্রীষ্মের স্তব্ধ দুপুরে, উত্তরের ঘরে প্রকাণ্ড কাঁচের জান্‌লাটা খুলে দিয়ে, আমি আবার ছবি আঁক্‌তে বসেছি। প্রখর রোদ থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে পাখীগুলো গাছের ঘন পাতার মধ্যে মাথা গুঁজে মন্দ-মন্দ শব্দ করচে। অদূরে বকুল গাছের চূড়ায় একটা কোকিল বসে স্বর-গ্রাম সাধ্‌ছিল। ব্রহ্মচারীদের মধ্যে কে একজন তার বিকৃত অনুকরণ করে তাকে চটিয়ে দিয়েছিল। ঠিক্ সেই সময়ে, আমার ছবির উপর অনেকখানি ছায়া ফেলে, কে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। ছবি থেকে থেকে মুখ তুলে তাকে দেখ্‌বার ফুরসৎ ছিল না—বল্‌লাম--"আঃ, আড়াল করিস্‌নে চন্দ্রনাথ, সরে দাঁড়া ভাই।"

কালো মেঘকে যেমন করে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে দিয়ে বিদ্যুৎ চম্‌কায়—তেমনি করে আমার ঘরের নিস্তব্ধতাকে হাসির উচ্ছ্বাসে খণ্ড-খণ্ড করে দিয়ে, সে হেসে বল্লে—"ফিরে দেখ—আমি চন্দ্রনাথ নই—আমি চকিতা।"

ফিরে দেখ্‌লাম—বালার্কের চেয়েও সুন্দর, নব-প্রস্ফুটিত কমলিনীর চেয়েও মধুর মুখশ্রীর মধ্যে চকিতার সেই নির্ম্মল শারদ-জ্যোৎস্নার মত হাসি!

আমার হাত থেকে তূলিটা পড়ে গেল;—আমি বল্লাম, "তুমি!"

সে হেসে, বল্লে—"হাঁ, আমিই তো—তোমাদের একবার দেখ্‌তে এলাম।" এক ফুৎকারে এক বছরের জমা করা নির্ম্মাল্যের রাশি কোথায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল! ঘটখানি তেমনি রয়েচে—মনে হল, তার ভিতরকার জল বুঝি বা ফুটে উঠ্‌বে!

চকিতা ঝাঁপিয়ে এসে আমার বুকের উপর পড়ল। আমার ব্রহ্মচর্য্যের পোষা ছাগলটি সিংহিনীর ভয়ে যেন মরে আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমার

মনে হলো, যেন সাহারার শুক্‌নো খাক্ মাটিতে বর্ষার স্নিগ্ধ জলধারা নাম্‌ল। ধীরে-ধীরে তার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বল্লাম,—"ছিঃ! অমন কর্‌তে নেই—আমরা যে ব্রহ্মচারী!"

চকিতা তার মুখখানি নিমেষে গম্ভীর করে—তার সরল দু'টো চোখের গাঢ় দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলে বল্লে, "তুমি ভারি দুষ্টু হয়ে গেছ—এত দিন পরে এলাম—একটু আদর পর্য্যন্ত কর্‌লে না?"—সে দ্রুতপদে নীচে চলে গেল।

হায় আদর! আমি যে ব্রহ্মচারী!

৬

কি কারণে চকিতাকে সেবাশ্রমে রাখা হলো না। গুরুদেব তাকে চট্টগ্রামের এক স্ত্রী-মঠে নিয়ে যাবার পথে আমাদের মঠে কয়েক দিন বিশ্রাম কর্‌বার জন্যে নেমেছিলেন। তাঁদের আসার কোন খবর আমরা পাইনি।

গুরুদেব বহুদিন আসামের পথে যান নি, একটি মেয়ে সঙ্গে করে একা যেতে তাঁর ইচ্ছাও হলো না। স্বামীজিকে তিনি সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ কর্‌লেন; কিন্তু তাঁর যাওয়া সম্ভবপর হল না। অবশেষে আমার যাবার কথা উঠ্‌ল।

ভগবান্ যে পতঙ্গের পাখা পোড়াবেন স্থির করেন, তারি কাছে প্রখর আগুনের সমাবেশ করেন। আগের মত হলে হয় ত আমি সোজা আপত্তি জানিয়ে দিতাম; কিন্তু যে নিজের কাছে নিত্য-নিয়ত অপরাধী

—তার আর তেজ থাকে না। এই বিষয়ে আমি চন্দ্রনাথকে ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছিলুম। সে হলে হয় ত কঠোর সত্যকে প্রকাশ করে বল্‌তে একটুও দ্বিধা করত না।

আমাদের কতক রেলে, কতক নৌকাতে যাবার স্থির হল। রেল-পথটা লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছিল। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এমন একটি মেয়েকে দেখে লোকের আর কিছু উদ্রিক্ত না হক—বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চকিতার ইতিহাস বল্‌তে বল্‌তে আমি ত' হয়রাণ হয়ে গেলাম।

নৌকার পথটি চমৎকার। লোকজনের হুড়োমুড়ি নেই, গাড়ী ধর্‌তে না পারার ভয় নেই, কুলির সঙ্গে অযথা বকাবকি নেই। চারিদিক্ শান্ত!

দিনের পর দিন. চমৎকার কেটে যেতে লাগ্‌ল। পদ্মার ভীষণ মূর্ত্তি নয়,—শান্ত, স্থির গ্রাম্য বধূটির মত তার ধীর ভাব। নীল আকাশের তলায়, স্বচ্ছ জলের উপর—মাঝিদের গান আর দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্ শব্দের তালে যেন সময়টা নটীর মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলে যেতে লাগ্‌ল।

গুরুদেব শাস্ত্রের আলোচনা কর্‌তেন; কত দেশ-বিদেশের গল্প বল্‌তেন; আমরা দু'জনে তন্ময় হয়ে তা' শুন্‌তাম!

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্নে মাঝিরা কিছুতেই নৌকা চালাতে রাজি হত না; সন্ধ্যাটা অতিক্রম করে আবার চল্‌তে সুরু কর্‌ত; কিন্তু সেদিন তারা বিকেল বেলাতেও চল্‌তে লাগ্‌ল; আমি জিজ্ঞাসা করাতে বল্‌লে, কাছের গ্রামে মাঝিদের মধ্যে একজন নেমে যাবে—তাই নৌকা চালাচ্ছে।

সূর্য্য প্রায় অস্তে যান এমন সময় বায়ু-কোণে কালবৈশাখীর তাণ্ডব

নৃত্য দেখে মাঝিদের মুখ শুকিয়ে গেল। ধূলো, বালি, শুকনো পাতার রাশ নিয়ে ভীষণ ঝড় দেখতে দেখতে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগল। পিছনে সূর্য্যের রক্তবর্ণ কিরণের জাল যেন স্পষ্ট বলে দিলে যে, বিপদ আসন্ন।

মাঝিরা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত কেমন হয়ে রইল—তারপর নৌকাখানা বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলে। কিন্তু সে চেষ্টা কোন কাজেরই হল না। পালখানা ছ'চির করে দিয়ে, ঝড় আমাদের নৌকা উল্টে ফেলে চলে গেল। নিমিষে আমরা জলের নীচে তলিয়ে গেলাম।

প্রাণের মমতা যে কি, তা' এত দিন শুনেই আসছিলাম—আজ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হল। বুঝতে পারলাম যে, এ যাত্রায় রক্ষা অসম্ভব; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করবার ভীষণ প্রচেষ্টাকে এক তিল ত্যাগ করলাম না। জলের তলায় নিমিষের মধ্যে আমার জীবনের পাতাগুলো যেন তাড়াতাড়ি কে উল্টে দিয়ে গেল—তাতে যে ছবি ফুটে উঠল, তা' বায়স্কোপের চেয়ে ঢের স্পষ্ট; ঢের ক্ষিপ্র!

একবার মনে হল আমার মরতে দুঃখ কি—কে আমার আছে? কিন্তু পরক্ষণেই আমার সমস্ত চেতনাকে মন্থন করে দিয়ে, হৃৎপিণ্ডকে যেন খণ্ড খণ্ড করে, একটা কান্নার উচ্ছ্বাস আমার গলা চেপে ধরলে।

হঠাৎ হাতড়ে একটা জানলা পেয়ে গিয়ে, তাই দিয়ে বার হয়ে পড়লাম। যখন জল ছাড়িয়ে মাথা জলের উপর উঠল, তখন মুক্তির কি গভীর নিশ্বাস! বাতাস এত মিষ্টি বোধ হয় এ জীবনে আর কখনো লাগবে না।

হাতের কাছেই দেখলাম, খুঁটি তোলবার মুগুরটা ভেসে চলেছে। পাশেই নৌকাটা উপুড় হয়ে ভেসে রয়েছে।

হঠাৎ কি মনে হলো—দেহতে অনেকটা বল পেলাম—সেই মুগুরটা হাতে করে, উল্টো নৌকার উপর উঠে পড়ে, সজোরে তার কাঠের উপর আঘাত কর্‌তে লাগ্‌লাম। বারকয়েক আঘাত কর্‌তেই, খানিকটা তক্তা ভেঙ্গে গেল। সেই ভাঙ্গার মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে চালিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, যদি কারুর পাত্তা পাই। শেষকালে সমস্ত দেহটা সেই ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে, দুই পা দুই দিকে বাড়িয়ে দিয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। এমন কতক্ষণ করেছি জানিনে—হঠাৎ একবার মনে হল—খানিকটা শন পায়ে জড়িয়ে গেল ; টান্‌তেই দেখ্‌লাম যে, একটা ভারি জিনিসের সঙ্গে সেটা জড়ানো—খুব জোরে টান্‌তেই বুঝ্‌তে পারলাম যে একটা শব। উপরে উঠে টেনে বার কর্‌লাম—চকিতা।

নৌকার পিঠে শুইয়ে দিয়ে তার দম ফিরে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কতক্ষণ চেষ্টার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল। তার পর ধুক্‌ধুক্ করে হৃৎপিণ্ড চল্‌তে লাগ্‌ল!

তখন আমার গুরুদেবের কথা মনে পড়ল। কিন্তু চকিতাকে ছেড়ে দিয়েই বা কেমন করে আবার খুঁজ্‌তে নামি। তার বাঁ হাতখানা চেপে চেপে ধরে, দেহটা সেই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, কত খুঁজলাম—কিন্তু আর কাউকে পেলুম না।

পরিশ্রান্ত হয়ে চকিতার পাশে বস্‌লাম। ঊর্দ্ধে চেয়ে গভীর রাত বলে মনে হল। আকাশ গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন। তারাগুলো সব ঝক্‌ঝক্ কর্‌চে। ধীর, মন্থর গতিতে নৌকাটা ভেসে চলেছে—কোথায়! কে জানে?

ঘুমে আমার চোখ ভেরে আস্‌ছিল। কিন্তু সংজ্ঞাহীনা চকিতাকে তেমনি অসহায় ভাবে ছেড়ে দিয়ে কেমন করে ঘুমোব?

কিন্তু ঘুম বাধা মানে নি—জানিনে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম

ভাঙ্গল একটা ষ্টীমারের ভোঁর গর্জ্জনে,—আমাদের খুব কাছ দিয়ে সেটা চলে গেল। ঢেউএতে আমাদের নৌকাটা কাত হয়ে গেল—আমরা দু'জনেই আবার জলে পড়ে গেলাম। বহু চেষ্টায় আর চকিতাকে নৌকার পীঠে তুল্‌তে পারলাম না—ভেসে যাওয়া ভিন্ন আর গতি রইল না। একটা বাঁশের মাঝখান ধরে, আর চকিতার কোমর জড়িয়ে, পদ্মার অকূলে আমি ভাস্‌তে লাগ্‌লাম। অন্ধকারে কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আকাশের নক্ষত্র দেখে ভয় করতে লাগ্‌ল—মনে হল, মৃত্যু তার লক্ষ চোখ দিয়ে যেন শিকার খুঁজ্‌চে!

ভোর হয়েছে। সকালের আলোর সঙ্গে আশার আলোও প্রাণে জাগ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু শরীর ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসে যে! মনে হ'ল, বুঝি আর চকিতার দেহের বোঝা বইতে পার্‌ব না।

বিপদের সময় একলা হয়ে পড়াটার একটা ভীষণ আতঙ্ক আছে। চকিতার জ্ঞান ছিল না, তবুও সে যেন অনেকখানি ভরসা। তাকে ছেড়ে দিতে কিছুতেই পার্‌ছি না—মনে হতে লাগ্‌লো, যদি তলিয়ে যাই ত দু'জনেই এক সঙ্গে যাই না কেন?

তখন কাব্য কর্‌বার সময় নয়;—তাকে যে জড়িয়ে রাখ্‌ছিলাম, সে নিতান্তই নিজের স্বার্থের জন্য। এ কথা সেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে এমন বিপদে পড়েচে।

জলের উপরে ভোরের সূর্য্যের কিরণের সিঁদূরের তুলি কে যেন বার বার করে বুলিয়ে দিয়ে গেল। লাল রংকে আমার ঠিক্ রক্ত বলে বোধ হলো—এমনি ভয়ভারাক্রান্ত হয়েছিল আমার মন!

দেখ্‌লাম, চারিদিকে লালের মধ্যে এক জায়গায় খানিকটা কালো কি রয়েছে! মনে হলো, রক্তের সমুদ্রের মধ্যে মৃত্যু তার মুখের করাল গহ্বরটা

খুলে রেখে দিয়েছে। এই কথাটা মনে পড়াতেই, আমার সর্ব্ব-শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ঠিক্ অনুভব কর্‌লাম, যেন একটা মৃদু টানে ঐ দিকে কে আমাকে টান্‌চে। তখন শরীরে এমন বল নেই যে সেখান থেকে সরে দাঁড়াই!

আলো বেড়ে উঠ্‌তেই দেখ্‌তে পেলাম যে, কালো জিনিসটা আর কিছুই নয় বালির চর। একটা দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত বুকটাকে খালি করে বেরিয়ে পড়ল! ভগবন্, তা' হলে তুমি আছ!

চরের উপর দু'টো হাঁস বসে ছিল; অত্যন্ত নিশ্চিন্ত তাদের ভাব! আমরা কাছে আস্‌তেই, ঘাড়টা উঁচু করে দেখে, ভারি বিরক্ত হয়ে যেন তিরস্কার করে উঠ্‌ল—কে তোমাদের এখানে জ্বালাতন কর্‌তে ডেকেছে? তার পর ডানা দু'টো মেলে দিয়ে, ঝপ্‌ঝপ্, সোঁ-সোঁ শব্দ কর্‌তে-কর্‌তে পশ্চিম দিকে উড়ে গেল। যেন তারা আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী ভালবাসে, লোকের চেয়ে নির্জ্জনতা বেশী পছন্দ করে!

হা ভগবন্! মানুষকে যদি অমনিতর দু'টো ডানা দিতে! তাকে এমন করে মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রেখে কি তোমার লাভ হয়েচে? কিন্তু এ সব তত্ত্ব আলোচনা কর্‌বার মত মনের অবস্থাটা তখন ছিল না। তখন দেহটা মাটিকে আলিঙ্গন করে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছিল; মনটা ঘুমের ভারে ভেরে আস্‌ছিল!

সঙ্গিনীকে তুলে শুক্‌নো বালির উপর শুইয়ে দিয়ে, আমি সেইখানে লুটিয়ে পড়লাম। যেমন করে রাত্রের অন্ধকার ধীরে-ধীরে পৃথিবীর উপর নেমে আস্‌তে থাকে, তেমনি ক'রে আমার সমস্ত দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে, ঘুম এসে পড়ল। মাটিটাকে মায়ের কোলের মত নিরাপদ বলে মনে হলো—সকালের হাওয়া যেন মায়ের নিশ্বাসের মত আমার

সমস্ত শরীরকে নিরাময় করে দিলে। আর কিছু মনে এল না—আমি গভীর ঘুমের সমুদ্রে নিমিষের মধ্যে ডুবে গেলাম!

সূর্য্যাস্ত হয়েছে—তখন আমার ঘুম ভাঙ্গল। কার কোলের উপর মাথা রয়েছে—কার দৃষ্টি যেন আমার মুখের উপর সংলগ্ন! শিয়রের সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখে, শৈশব যেন তার বিস্মৃতির ভারি পর্দ্দাখানা দু' হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেরিয়ে এল। বুকের রক্ত কোটালের বানের মত ফুলে ফুলে উঠে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে দেবে। আমি চুপ্ করে পড়ে চকিতার মুখখানি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বল আলো সেই মুখখানির উপর প্রতিবিম্বিত—তাতে কোন উদ্বেগ নাই—কেবল ডাগোর দু'টো কালো চোখ গাঢ় বিষাদে নিবিড়! কাণে ঢেউয়ের শব্দ আস্‌চে—ফাঁকে-ফাঁকে স্রোতের একটানা সুরটাই যেন মনে হলো মানুষের জীবনের আদি সুর—তারি কাছে কাছে যেন আর সুরগুলো উঁচু-নীচু হয়ে খেলা কর্‌চে!

আকাশের নীচের সেই স্তব্ধটাকে ভেঙ্গে কথা কইতে আমার সাহস হলো না! পদ্মার স্রোতের জলের সঙ্গে চোখের জল মিলিয়ে দিয়ে একটা বিরাট্ কান্নায় আমার বুক ভরে উঠ্‌ল—নদীর গর্জ্জনের গভীরতার সঙ্গে আমার দীর্ঘনিশ্বাসের সুরটা যেন এক হয়ে মিলিয়ে লীন হয়ে যাবে!

উঠে বস্‌তেই—সকালের সেই ছবিটি চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ল! হংস-মিথুন পদ্মার চরের উপর মুখোমুখী করে বসে আছে! কে তাদের এই নির্জ্জনতার মধ্যে এক কর্‌লে—যেন জগতের আর সবই কিছু তাদের কাছে তুচ্ছ—নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ মিলনই যেন বিশ্বের মধ্যে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার জিনিস!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মাথার উপর নক্ষত্রগুলো ঝক্‌ঝকিয়ে উঠ্‌ল! দু'জনের মধ্যে এক হাতের ব্যবধানটাও যেন মস্ত বলে মনে হলো! জানিনে—কখন—কেমন করে দু'জনে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসেছি। দেখ্‌লাম, চকিতার দেহের উত্তাপ ঠিক্ আমার দেহের অনুরূপ। তার শিরার রক্ত যে তালে নাচ্‌চে—তারি অনুরূপ নৃত্য আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে! মনে হলো, সেতারের এক সুরে বাঁধা দু'টো তার, যেন একটা আঙ্গুলের আঘাত পেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বার প্রতীক্ষাতেই রয়েছে!

সে ঝঙ্কার শুন্‌বার ইচ্ছা আমার হয়েছিল কি না, মনে নেই। যদি হয়ে থাকে, তা'হলে কি আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়?

কি জানি—আমি যে মঠের ব্রহ্মচারী!

৭

এত বড় বিপদে চোখের জল ডবে যায়। এ যেন কামারের বিশাল হাতুড়ির তলায় পেতল আর লোহার পাতকে এক করে জুড়ে দেবার একটা অসম্ভব চেষ্টা! বিদ্যুৎ-পরিপূর্ণ দু'খানা মেঘ কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের মিলন হবে বজ্রের অগ্নি আর করকার নির্ঘোষে! সেই ভীষণ সম্ভাবনার ভয়ে আমার বুক দুদ্দুড় কর্‌তে লাগ্‌ল!

আকাশে নক্ষত্রের চাকা প্রহরের পর প্রহরে ঘুরে যেতে লাগ্‌ল—আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। শেষরাত্রে পূব আকাশের তলায় মোচার খোলার মত ত্রয়োদশীর খণ্ড চাঁদ দেখা দিলে। তারি আলো পদ্মার বুকের উপরে পড়ে ঝিকৃঝিক্ করে উঠ্‌ল। মাথার উপর দিয়ে একদল নিশাচর পাখী শব্দ করে উড়ে গেল।

আলো দেখে আমার সাহস হলো—আমি ডাক্‌লাম—"চকিতা!"—আমি নিজেই সেই শব্দ শুনে চম্‌কে গেলাম।

চকিতা চম্‌কে উঠে বল্লে—"চকিতা কে?—আমি অমিয়া!"

আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বল্লুম—"সে কি?"

ক্ষীণ চাঁদের আলোতে তার মুখখানা দেখে মনে হল, একদিন ঠিক্ এই মুখই দেখেছিলাম—মঠের বাঁধা ঘাটের পাশে এ যেন চাঁদের আলোতে মলিন শ্বেত-কমল!

চকিতা বল্লে—"বাবা কোথায়?"

সে গুরুদেবকে বাবা বল্‌ত। আমি কথার উত্তর দিতে পার্‌লাম না।—কোথায়? কে জানে?

মনের মধ্যে এই প্রশ্ন ঘূরে-ঘূরে পাক খেতে লাগ্‌ল ;—ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল; বাবা কোথায় !—মাথার উপর পাখী উড়ে-উড়ে যেন সেই কথাই একশ'বার করে জিজ্ঞাসা করে ফির্‌তে লাগ্‌ল !

আমি বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, রুদ্ধ নিশ্বাসে সে আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রয়েছে ; কিন্তু কি উত্তর আমি দেব ? আমার মনে হলো যে, গুরুদেবের জীবনের জন্য আমিই কেবল মাত্র দায়ী। হঠাৎ আমার চিত্ত হত্যাকারীর তীব্র অনুশোচনার ব্যথায় মথিত হয়ে উঠ্‌ল। আমি নির্ব্বাক্‌, নিস্পন্দ হয়ে রইলাম।

ক্রমেই দিনের আলো ফুটে উঠ্‌ল। চকিতা আমার মুখ তীব্র ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে বল্লে, "তোমায় কোথায় দেখেছি যেন মনে হয়।"

অতিমাত্র বিস্ময়ের সঙ্গে আমি বল্লাম, "তুমি বল কি, চকিতা ?"

"চকিতা কে ?"

আমি বুঝিলাম যে, চকিতার মাথায় আরও কিছু গোল দাঁড়িয়েছে। তাকে বল্লাম, "তোমার কি মঠের কথা, স্বামীজির কথা, গুরুদেবের কথা কিছুই মনে নেই ?"

চোক বুজে অনেকক্ষণ ভেবে সে বল্লে, "হাঁ. মনে পড়ে বটে ;—কিন্তু সে কত দিনের কথা, বল ত ?"

চকিতার মঠে যাবার আগে যে নৌকাডুবি হয়েছিল, সেই কথাই তার মনে তখন প্রবলভাবে আস্‌ছিল। সে যে তার বাবার কথা বল্‌ছিল—আমার অনুমান মত সে গুরুদেবের কথা নয়। এমনই করে তার লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আস্‌ছিল।

আমি মনস্তত্ত্ববিদ্‌ দার্শনিক নই ;—নইলে, এই ব্যাপারটার আলোচনা

করে, হয় তো একটা মস্ত পুঁথি লিখে, জগৎকে এক অভিনব সত্য উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু আমার সে সুবিধা মোটেই ঘটে উঠেনি। তার আর এক কারণ এই যে, এই নাট্যের আমিই যে একজন অভিনেতা হয়ে পড়েছিলাম। হৃদয়-রাজ্যের ভাবরাশির উদ্বেলতাকে উপযুক্ত ভাবে সংযত করবার যথেষ্ট ক্ষমতার অভাব আমার চিরদিনই যে ঘটে এসেচে!

হৃদয় যখন অপার বিস্ময়ে পরিপূর্ণ, তখন আর একটা বৃত্তির সাড়াতে কতকটা কাতর হতে হয়েছিল। অচিরে তার একটা উচিত মত ব্যবস্থা না করতে পারলে, দেহ-পিঞ্জরে প্রাণ-পাখীটিকে ধরে রাখবার উপায় ছিল না। আমরা দু'জনেই ক্ষুধার তাড়নায় একান্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু কি উপায় হবে!

নির্জীব ভাবে যখন প্রহরের পর প্রহর কেটে যেতে লাগল—তখন আমার জঠরটাকে মহাব্যোমের চেয়ে অধিক শূন্য বলে মনে হলো। তার মধ্যে যে অগ্নি জ্বলে উঠেছিল, তাকে কি দিয়ে নিভাই?

পদ্মার রাশি-রাশি জলে সে আগুন নেভে না। অগত্যা চরের চারিদিকে দেখতেই হলো—যদি কোন শিকড়-পাকড় পাই! সেই নূতন বালিতে কোন গাছপালা এত শীঘ্র জন্মিতেই পারে না। আমার রামচন্দ্রের বালির পিণ্ডের কথা মনে হলো, কিন্তু সে যে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবস্থা—আর এ যে স্থূল দেহের মারাত্মক দাবী।

খুঁজতে-খুঁজতে এক জায়গায় দশ-বারটা রাঙ্গা আলু বালির গায়ে পোঁতা রয়েছে দেখতে পেলাম; দেখে, কি আনন্দ যে হলো, তা ভাষায় বলতে পারিনে। তখনই বিদ্রোহী মন ভগবৎ-ভক্তিতে অবনত হয়ে পড়ল। দু'জনে চরের উপর বসে-বসে আলু চিবুতে লাগলুম। স্বর্গের অমৃতের চেয়ে তা অধিক মধুর বলে বোধ হল।

মাথার উপর দিয়ে সূর্য্য তাঁর অশ্রান্ত গতিতে আকাশের পথে ছুটে সেদিনের জন্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়্বার উপক্রম কর্‌চেন—এমন সময় একটা জাহাজের 'ভোঁ' কাণে এল। আমরা দু'জনে শকুনের চেয়ে তীব্র দৃষ্টিতে দিক-চক্রের এক দিক্ থেকে আর এক দিক্ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লাম। কোথাও কিছু দেখা গেল না।

দিন শেষ হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার যেমন ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—আমরাও তেমনি কাছাকাছি হতে লাগ্‌লাম। কিছুতেই মন উঠে না—আরও কাছে—আরো কাছে!

নিরুপায় দু'জনে ধরণীর কোলের উপর লুটিয়ে পড়ে, কিসের আশায়—কার প্রতীক্ষায় রইলাম, কে বল্‌তে পারে?

চকিতা বল্লে,—"আমাকে অমিয়া বলে ডেকো; চকিতা—আমার ভাল লাগে না।"

আমি নিস্তব্ধভাবে তার কথা শুনে যেতে লাগ্‌লাম! বনের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেমন করে গুণ-গুণিয়ে আপনার কথা নিশীথিনীকে বলে যায়—তেমনি করে তন্দ্রাজড়িত আমার আচ্ছন্ন মনের কাছে তার জীবনের কাহিনীর ক্ষীণ তারাটি সে গুণ-গুণিয়ে বাজাতে লাগ্‌ল। সেই ধ্বনিতে যেন সমস্ত বাতাস কেঁপে-কেঁপে উঠে, মাথার উপরকার নক্ষত্রের শিখা-গুলোকে পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিলে!

অমিয়া যে গরীবের মেয়ে নয়, তা' আমরা জান্‌তে পেরেছিলাম তার হাতের আংটিটা থেকে! কত দিন তার পাথর থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়তে দেখিচি। তাই সে যখন বল্লে যে তার বাপ জমিদার, তখন আমার মনে হলো, শুনা কথাই আর একবার শুনা হচ্চে।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা জানিনে। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন

দেখ্‌লাম, অমিয়া আমায় জড়িয়ে ধরে ভয়ে তালপাতার মত থরথর করে কাঁপ্‌ছে। সামনে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দাঁড়িয়ে—চোখ দু'টো লাল টক্‌টকে—তার প্রকাণ্ড জিভখানা লক্‌লক্ করে একবার চরের এদিকে ফেল্‌চে—আবার ওদিকে ফেল্‌চে !

ঘুম ভেঙ্গে এই বিভীষিকা দেখে আমি ভীষণ চীৎকার করে উঠ্‌লাম। সেই চীৎকারটা মাথার মধ্যে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। তার পরেই মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যেতে বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, চরের উপর আমরা দু'জনে নিশ্চিন্ত হলেও দেবতা নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

সেখানা একটা মস্ত ষ্টীমার। লাল দু'টো চোখ—দু'টো লণ্ঠন ;—আর যাকে জিভ বলে মনে হয়েছিল, সেটা তার তীব্রোজ্জ্বল সার্চ লাইট !

ছপ্‌ছপ্ শব্দ করে জালি বোটখানা চরের দিকে এগিয়ে এল। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় একজন চেঁচিয়ে বল্লে, "তোমরা কে ?"

আমরা এই বোটে চড়ে ষ্টীমারে গিয়ে উঠ্‌লাম। তেতালায় কেবিনের মধ্যে সারেঙ্গের অনুকম্পায় আমরা জায়গা পেলাম।

এ পৃথিবীতে যিনি ভাঙ্গেন—তিনিই যে গড়বার মালিক,—এই কথা আমাদের ষ্টীমারে যেতে যেতে লক্ষবার মনে হতে লাগ্‌ল। অদ্ভুত কিন্তু তাঁর দয়া দেখাবার রীতি !

শুনেছি অজগর তার আহারটা পেটের মধ্যে পুরে নিয়ে, কয়েক দিন ধরে তাকে জীর্ণ করতে থাকে। তখন সে সুখে নিদ্রা যায়, আর পেটের মধ্যে অজস্র জারক রস ক্ষরিত হতে থাকে। ঠিক্ তেমনই করে এই রমণীটির সান্নিধ্য ধীরে ধীরে ব্রহ্মচারীর পরুষ মনটিকে জীর্ণ করে, মসৃণ করে দিচ্ছিল কি না, বলা শক্ত! কিন্তু একটা অসাধারণ কিছু যে ঘট্‌ছিল, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

স্বামীজি বল্‌তেন, প্রেম জিনিসটা মনের একটা বিলাসিতা মাত্র। এই কথাটায় আমার গভীর বিশ্বাস আছে। কঠোর শোক, তাপ, দুঃখ, দৈন্যের ভিতর মানসিক অবস্থা কোন দিন স্ফূর্ত্তি লাভ কর্‌তে পারে না। যখন মনটা পরম স্বস্তিতে মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তখনই এই উৎপাতে সে উৎপীড়িত হয়।

আমরা, স্বামীজি যা বল্‌তেন, তা কেমন অনায়াসে মেনে নিতুম; কিন্তু চন্দ্রনাথের পথ ছিল একটু স্বতন্ত্র—সে চট্ করে কেমন একটা অন্য রকম ভেবে নিতে পারত। চন্দ্রনাথ বল্লে, "যদি তাই হয়, তা'হলে, তপশ্চারণ কালে মহাদেবের গৌরীর প্রতি আকর্ষণের কথাটা কি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করতে হবে?"

স্বামীজি বল্লেন, "তিনি যে দেবাদিদেব,—তাঁর মনের গতি কি সাধারণ মানুষের মনের গতির মত হবে? তাঁর আবার শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, জরা-মরণ আছে না কি? তিনি যে প্রেমময়!"

এই কথা আমার খুব ভাল্ লেগেছে। বাস্তবিক, প্রেম যদি দেহকে

ছাড়িয়ে না উঠে, তবে ত সে দেহেরই একটা অবস্থা স্ফুরণ মাত্র। দেহ যা চায় তা' দেহেরই আকাঙ্ক্ষা—তা' পেলে হয় ত দেহ তৃপ্ত হতে পারে; কিন্তু সেখানে মনের তৃপ্তি কোথায়? তাই বিশ্ব-সংসারে ভালবাসার পিছনে লালসার ফুৎকার—তাই সেখানে অশান্তির হলাহল!

ষ্টীমারের তেতালার কেবিনে, অমিয়ার মত একটি মেয়েকে এমন নিঃসঙ্গ ভাবে পেয়ে যে একটা কাব্যরাজ্য সৃজন করা যেতে পার্‌ত—তা' আমি অস্বীকার করিনে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর সাধন এবং আজন্ম শিক্ষার সঙ্গে তার যে একটা জাতিগত বিরোধ ছিল, সে কথাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করবে না। অপর একটা দিক্ যে সাধারণের কল্পনার বাইরে ছিল, সে কথাটাও এখানে বলা দরকার। সেটা অমিয়ার মনের কথা। তাকে দেখে আমাদের একটা শিউলি গাছের এক বছরের কাহিনী মনে পড়ত। মঠে একটা বুড়ো শিউলি গাছ ছিল,—তার ছোট-ছোট ফুল হতো। স্বামীজি বল্লেন তাকে ছেঁটে দিতে। উপানন্দ তাকে এমনি ছেঁটে দিয়েছিল যে, সে বছর শরতের মেঘ-রৌদ্র, আলো-ছায়া, শিশির-তাপ কিছুতেই কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌লে না। সমস্ত বছরটা তাতে ফুলই হ'ল না। অমিয়ার জীবনেও ঠিক্ এমনি একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল—তাই সে কাব্য অভিনয়ের মত করে নিজেকে কিছুতেই ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে না। আমাদের হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব সবই যেন রাখাল বালকের লীলায় পর্য্যবসিত হলো। যৌবন-নিকুঞ্জের দোরে চাবি দেওয়াই রয়ে গেল!

ষ্টীমারে আমাদের ভাড়া লাগেনি; কিন্তু আর-আর খরচ কেমন করে চলে? দু'এক দিন লোকে চাল-ডাল দিয়েছিল। এই চিন্তা আমার তখন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিল। ভেবেই উঠ্‌তে পার্‌ছিলাম না, এর

সমাধান কোথায়! অমিয়াকে এই দুশ্চিন্তার অংশ দিয়ে কোন লাভ ছিল না; তাই নিজের ভিতরেই তোলাপাড়া করে সময় কাটাচ্ছিলাম।

সন্ধ্যার সময় চুপটি করে এক ধারে বসে ছিলাম। দক্ষিণ আকাশে সামান্য মেঘ-সঞ্চার হচ্ছিল। সারেঙ্গ ষ্টীমারটা আগের ষ্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে একটু বেশী চালিয়ে চলেছিল। রাত্রে সেখানেই থাকা স্থির করেছে। দু'জন খালাসি জল মেপে-মেপে সুর করে বল্‌চে—"এক বাম মিলে না—সাড়ে এক বাম মিলে না।"

অমিয়া ছুটে এসে, ঝাঁপিয়ে আমার পিঠের উপর পড়ে খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল। বল্লে, "ওরা দেড় বলে না, বলে সাড়ে এক।"

আমি হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু সে হাসি বর্ষার মেঘ-বিজড়িত চাঁদের হাসির মত—মেঘ ফুটে যেন বার হ'তে পার্‌লে না।

অমিয়া আমার পাশে ধপ্‌ করে বসে পড়ে, আমার হাতখানা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে,—"সত্যি কথা বল্‌বে?"

আমি মৃদু হেসে বল্লাম, "আমাদের যে মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই!"

মুখখানা লম্বা করে বিদ্রূপের স্বরে সে বল্লে, "তোমরা সব যুধিষ্ঠিরের দল—যেন কোন দিন মিথ্যে বলনা—আমি সব জানি।"

"কি তুমি জেনেছ অমিয়া?"

"তা বল্‌ব কেন—তুমি কি সব কথা আমাকে বল?"

আমি চুপ করে রইলাম। অমিয়া আমার আঙ্গুলগুলো মট্‌কে দিতে লাগ্‌ল। আমাদের গায়ে চতুর্থীর ক্ষীণ জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল—সেই আলোতে অমিয়ার আংটিটা মাঝে মাঝে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে উঠ্‌ছিল। আমি তারি দিকে এক-একবার লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিলাম।

সে বল্লে, "এই আংটিটা খুলে দাও ত!"

"কেন ?"

"জলে ফেলে দেব।"

"হঠাৎ ওর ওপর চটে গেলে কেন ?"

"ওটাতে যে ব্রহ্মচারীর লোভ হয়েছে—ওকে আর কাছে রাখ্‌ব না।"

আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল।

সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, টেনে-টেনে সে আপনি খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল। "আমিও আজ হতে তোমার মত নিরাভরণ হব—কাজ নেই এই উৎপাতে।"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—"তুমি কি ব্রহ্মচারী, যে, অলঙ্কার ত্যাগ কর্‌বে ?"

কিছু না বলে, সে আমার বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে, তার একটা আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "আজ থেকে তুমি আর ব্রহ্মচারী নও। যদি এই আংটি খুলে ফেল ত আমার মাথার দিব্য।"

ষ্টীমারের ভোঁ হঠাৎ বেজে উঠ্‌ল। তার ভিতর যেন কিসের একটা মাদকতা! ঊর্দ্ধে, আকাশে চেয়ে দেখ্‌লাম,—মনে হল, যেন একটা নীল চাঁদোয়া—তাতে তারার ঝাড় জ্বলচে!

অমিয়া তখনো আমার হাত চেপে ধরে রয়েচে—তার হাতের ভিতর দিয়ে আমার হাতের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের ক্ষীণ প্রবাহ আস্তে-আস্তে প্রবেশ করচে।

ক্ষণেকের জন্যে আমি যেন সব ভুলে গেলাম। আমার বুকের মধ্যে কিসের সমুদ্র তোলপাড় করে উঠ্‌লো—দু'হাত দিয়ে অমিয়ার মাথাটা জড়িয়ে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বল্লাম, "দিদি, আমি যে ব্রহ্মচারী!"

সমস্ত দেহের ছিদ্রে ছিদ্রে কানায় কানায় একটা বিপুল মন্দ-মধুর ব্যথার উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। অমিয়ার মাথার উপর একটি ছোট চুমু দিতেই —চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল!

৭

চোখে ঘুম এল না। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় নেমে গিয়ে দেখ্‌লাম সারেঙ্গ একটা কেরোসিনের কুপি জ্বেলে, একখানা মোটা-মোটা অক্ষরে ছাপা হিন্দি বই খুলে, যত না পড়চে, তার তিনগুণ কাঁদচে! তাই দেখে আমার অশ্রু-সাগরে যেন জোয়ার এল। পাশে বসে চুপ করে শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

প্রজারঞ্জনই রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—তার কাছে আর সবাই ছোট! কিন্তু কেমন করে রঘুপতি আজীবন জনক-দুহিতার বিরহ-বেদনা সহ্য কর্‌বেন! এই ভাবনার কুল-কিনারা নেই! সেই শ্রেয় এবং প্রেয়র দ্বন্দ্ব এখানেও। হে সংসার, প্রিয়তমাকে লাঞ্ছিত করতে কেন তুমি এত নির্দ্দয়ভাবে প্রস্তুত! নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য তার বিজয়-রথখানা কি মানুষের মনের হাড়-পাঁজর চূর্ণ করে, চিরদিনই হৃদয়ের উপর দিয়ে এমনি করে চালিয়ে যাবে?

সারেঙ্গ নাক ঝেড়ে, ভারি গলায় বল্লে, "কিন্তু মহারাজ, জানকীনাথের এ কাজ আমার উচিত বলে মনে হয় না। রাজা কি মানুষ ন'ন—স্ত্রীর প্রতি কি তাঁর কর্ত্তব্য ছিল না? আমি হলে রাজ্য ত্যাগ কর্‌তাম—সীতাকে ত্যাগ কিছুতেই কর্‌তে পারতাম না।

রঘুবীরের চরণে সহস্র প্রণতি—কিন্তু তিনি কাজটা মোটেই বীরের মত করেন নি—রাজ্যই তাঁর কাছে বড় হল! প্রেম কি কিছু নয়?"

আবার সেই কর্ত্তব্য—সেই প্রেম! আমি বল্লাম, "সারেঙ্গজী—আমরা সন্ন্যাসী; প্রেমের কথা কেমন করে জান্‌ব? কর্ত্তব্যকেই আমরা বড় বলে মানি।"

হঠাৎ আমার মনের সামনে অমিয়ার বিদ্রূপভরা চোখ্ দু'টো ফুটে উঠ্‌ল—সে বলেছিল, তোমরা যুধিষ্ঠিরের দল!

হে সত্য, তোমাকে যে প্রকাশ কর্‌বার উপায় নেই! হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে তুমি ওই কার ভয়ে অবগুণ্ঠন দিয়ে বসে আছ! তোমাকেই সব চেয়ে ভালবাসি। কিন্তু সে গোপনে! নিভৃত নির্জ্জনে তুমি সাপের মণিটির মতই চিত্ততল উদ্ভাসিত কর; কিন্তু সে নির্ম্মল জ্যোতিঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই ত থেকে যায়!

সারেঙ্গ বল্লে, "আমারও একদিন সন্ন্যাসী হবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। প্রয়াগে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিতে গেলাম; কিন্তু দীক্ষা তিনি দিলেন না, বল্লেন, "বেটা, এ পথ ঠিক্ নয়—আগে একজনকে ভালবাস্‌তে শেখ, তবে বিশ্বপ্রেম আস্‌বে। বিশ্বপ্রেম কি ঠাট্টার কথা!"

"তার পর?"

"তার পর আর কি?—সাদি কর্‌লাম—করে এই সংসার-ধর্ম্ম পালন কর্‌চি। মহারাজ, সিঁড়ি নইলে কি ছাতে যাওয়া যায়?"

আমার হাতে আংটিটা ছিল। তার উপর একটা বিদ্যুৎ কটাক্ষ করে সারেঙ্গ মৃদু হেসে, গুণ-গুণ করে গাইতে লাগল:—

"বৈরাগ যোগ কঠিন উধো, হাম ন করবো হো
আরে হাম ন করবো হো।"

লজ্জায় মলিন হয়ে গেলাম।

এমন সময় বার দুই দপ্ দপ্ শব্দ করে কুপিটা নিবে গেল। আমি যেন বাঁচলুম।

মনে হলো, এই তক্কে আংটিটা খুলে জলে ফেলে দি। টানাটানি কর্‌লাম। কিছুতেই খোলে না! দূরে বড় আলোটা জ্বল্‌ছিল—দেখ্‌লাম চুণী-দু'টো যেন রক্ত চক্ষে বল্‌চে, তা হবে না—তা হবে না, হীরেটার ভিতর থেকে শুভ্র জ্যোতিঃ ঝল্‌কে উঠ্‌চে। মনে হল, এই সেই সত্যের নির্ম্মল আলো—তাতে কোন রাগ নেই, রঞ্জন নেই—সোজা, সরল, অন্তর থেকে বাইরে বিচ্ছুরিত হচ্চে—তার কোন নিরোধ, কোন বাধা নেই। মনে হলো, প্রেমের আলো এমনি সহজ-সরল, স্বচ্ছ-নির্ম্মল—মনে হলো, তাই বুঝি মানুষের একমাত্র পথ!

কেতাবের উপর গানের সঙ্গে তাল দিতে-দিতে সারেঙ্গ নিজের ঘরের মধ্যে চলে গেল। বিরাট্ নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার ক্ষুব্ধ চিত্ত আকাশে-বাতাসে—পদ্মার জলের মধ্যে, সঙ্গী খুঁজে ফিরে মরতে লাগ্‌ল! কোথায় যাই? কি করি?

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌লাম। চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার উপর বৃহস্পতি আকাশের অনেকখানি অন্ধকার আলো করে, স্তব্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে।

গরম বোধ হওয়াতে অমিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে শুয়েচে। আমি পা টিপে-টিপে তার পাশে গিয়ে বস্‌লাম। বৃহস্পতির মত প্রগাঢ় দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতে আমার ইচ্ছে হলো। মনে হলো, তেমনি করে যুগ-যুগান্তর ধরে ঐ মুখের দিকে কি চেয়ে থাকা যায় না!

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল—আমি স্থির হয়ে তেমনি করে তাকিয়ে

রইলাম। দেহের দিকে-দিকে যেন কিসের ক্ষুব্ধতা সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আকাঙ্ক্ষা-সমুদ্রের তীরে বেদনার ঢেউগুলো অভ্রভেদী পাহাড়ের মত উদ্দাম হয়ে আমাকে উন্মাদ করে দিলে!

ব্রহ্মচারীর আজন্ম সাধনার বৈরাগ্যের প্রতিমাখানি প্রেমের অমৃত সমুদ্রের অতলে নিমেষে মিলিয়ে গেল! ধীরে-ধীরে অমিয়ার অধরের উপর একটি ক্ষুদ্র চুম্বন মুদ্রিত করতেই, সে পাশ ফিরে শুলো।

হৃদয়ের মূল থেকে একটা ধিক্কারের নিষ্ঠুর ছুরি উঠে, সমস্ত অনুভূতিকে কেটে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল।

ওরে কপট ব্রহ্মচারি!

১০

আহত সৈনিকের মত, সকালে উঠে দেখ্‌লাম আমার সমস্ত দেহ-মন একটা মর্ম্মান্তিক ব্যথায় যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। পরাজয়ের কথা মনে করতেও লজ্জা বোধ হলো। কেবল ইচ্ছে হলো, উল্কার মত খসে পড়ে, আমার যা-কিছু-সর্ব্বস্বকে নিঃশেষে ভস্ম করে দিয়ে, আমি নিমেষে শেষ হয়ে যাই!

অমিয়ার মুখখানিতে সকালের সদ্য-ফোটা ফুলের প্রসন্ন-বিমলতা! তাতে অপরাধের লজ্জার ক্লেদের একটি রেখাও নেই। আমার মনটা যেন তার কাছে কুঁকড়ে কালো ছোট্টটি হয়ে গেছে!

এ যেন পূর্ণিমা নিশান্তে সূর্য্যি আর চাঁদ, পূবের আকাশে কি নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক দীপ্তি; আর পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে নিষ্প্রভ মলিনতা!

অনুতাপের তিক্ত গ্লানিতে আমার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

আস্তে-আস্তে নীচে নেমে গেলাম। সেথানকার যাত্রীদের কোলাহল মিষ্টি বোধ হলো। অপরাধটাকে লুকিয়ে ঢেকে ফেলবার যেন কত শত উপায় রয়েছে!

সারেঙ্গ হেসে বল্লে, "কি মহারাজ—আজ এত সকালেই যে অধোগতি হলো।"

সে বেচারার নির্জ্জলা হাস্য-পরিহাস করা ভিন্ন আর কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না—কিন্তু তার কথাটা আমাকে একটা এমন নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ধাক্কা দিয়ে গেল,—যার প্রত্যাশা আমি এক পলের জন্যও করিনি!

আমার হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। কিন্তু তার কাছে এত উপকার পেয়েছি যে, সে রাগটা কিছুতেই ফস্ করে বেরিয়ে পড়ল না। দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁটটা চেপে ধরে, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লাম, "মর্জ্জি।"

অপরাধীর মন এমন সন্দিগ্ধ—সে হাসিও আমার কেমন ভাল লাগ্‌ল না। আমি তাই নীচের তালায় নেমে গেলাম।

সারেঙ্গ হাস্‌তে লাগল।

এথানে স্তূপীকৃত মাল আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর অসম্ভব ভিড়। অনেকেই তথনো উঠেনি। যারা উঠেছে—তারাও তথন চুপ করে বসে আছে। একটা বোরার উপর গিয়ে বসে, লোকদের কর্ম্মহীন অব্যস্ততা, দেখ্‌তে লাগলাম। যাদের দিন-রাত থাট্‌তে হয়, তাদের পক্ষে এই কর্ম্মহীনতা ক্লেশকর। একটি লোককেও যেন প্রসন্ন দেখ্‌লাম না। সবাই যেন বেজায় বেজার হয়ে পড়েচে।

ষ্টীমার গর্জ্জন করে দুলে উঠ্‌ল।—সমস্ত দিনের চলা তার আরম্ভ

হয়ে গেল। হাওয়া-চলাচল সুরু হলে, লোকে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

কয়েকজন লোক কাছে বসেই জল্পনা-কল্পনা সুরু করে ছিল; একজন বুড়ো হাতে হুঁকোটি নিয়ে নাক বেঁকিয়ে বল্লে, "ও বাঁচা শক্ত, শেষ-রাতের ভেদ-বমি—এত বয়স পর্য্যন্ত একটাও ত সেরে উঠ্‌তে দেখ্‌লুম না।"

আর একজন উত্তরে বল্লে, "ও আদত কাল—কালে ধরলে কে কবে বেঁচে ফিরে আসে।"

আমি, দলের মধ্যে নেমে পড়ে বল্লাম, "কি হয়েছে, কার?"

বৃদ্ধটি এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বল্লে, "অনাথা বিধবার এক ছেলে—শেষ রাত থেকে কালে ধরেচে।"

"কি হয়েছে তার?"

"আর কি হবে,—সাক্ষাৎ যম এসেচেন; ভেদ-বমি গো—ভেদ-বমি।"

"কোথায় তারা আছে? একবার দেখ্‌তে পাইনে?"

বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে সেই দিকে দেখিয়ে দিলে।

গিয়ে দেখ্‌লাম—বছর-বারো বয়স,—ছেলেটি তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করচে; আর বিধবা শিয়রে বসে অনর্গল অশ্রু ত্যাগ করচে।

নাড়ী টিপে দেখি, দমে গেছে।

"কতক্ষণ থেকে এমন হয়েছে মা?"

"রাত এক পহর থাকৃতে।"

ছেলেটি বল্লে—"মা, জল দে না।" তার কথা হাঁড়ির মধ্যে। চোখ্‌ দু'টো কোটরের মধ্যে বসে গেছে,—নাকটা খড়্গের মত উঁচু!

"জল দিচ্চ না কেন, মা?"

"সবাই মানা করেছে বাবা।"

আমি বল্লাম, "না, না—জল দাও মা, জলই যে ওর ওষুধ।"

"কি জানি বাবা,—যে যা বল্‌চে,—আমি ত কিছুই জানি নে।"

"ওকে জল দাও।"

জল খেয়ে ছেলেটি একটু ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি ছুটে উপরে উঠে গেলাম। দেখ্‌লাম, সারেঙ্গ এক মনে বসে-বসে একটা থালের উপর আলু আর পেঁয়াজ কুচি-কুচি করে রাখচে।

আমি গিয়ে পাশে বস্‌লাম।

"সারেঙ্গজি—একটা অনুরোধ রাখবে?"

"কি মহারাজ?"

"আজ কতক্ষণে তোমার জাহাজ থাম্‌বে?"

"আজ আর থামাবো না—রাত ন-বাজে দেবীগঞ্জে দিয়ে দাঁড়াবো।"

"কাছে কোন বড় গ্রাম নেই?"

"আছে বৈ কি? কিন্তু তাতে মাল উঠে না—আমাদের মাল না থাক্‌লে—পেশেঞ্জারের জন্যে দাঁড়াবার মাথা ব্যথা নেই।"

"কাছাকাছি কোন্ গ্রাম আছে সারেঙ্গজি?"

"ঐ যে দবিরপুর দেখা যাচ্চে—ওটা একটা ভারি গাঁ।"

"সারেঙ্গজি একটি কথা রাখ—দবিরপুরে একবার কিছুক্ষণের জন্যে জাহাজ ভিড়াও।"

"কেন?"

"নীচে একটি বিধবার ছেলের হায়জা হয়েছে—যদি ডাক্তার ডেকে আন্‌তে পারি।"

"আচ্ছা, কিন্তু এক ঘণ্টার বেশী দেরী করতে পারবো না।"

"তাতেই হবে।"

দবিরপুরের ঘাটে এসে ষ্টীমার ভোঁ দিয়ে দাঁড়াল। এ গ্রামে ষ্টীমার কোন দিন দাঁড়ায় না—তাই ছেলে-বুড়ো সকলেই এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে ছুটে এল।

খালাসিরা তক্তা ফেলে দিতেই—নেমে পড়ে, একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করলাম—"মশাই, এ গ্রামে ডাক্তার আছে?"

"আছে বৈ কি।"

"কত দূরে তাঁর বাড়ী?"

"পোয়াটেক্।"

"এই পথেই?"

"হাঁ—খানিকটা গিয়ে বাঁ হাতি সড়ক ধরে যেতে হবে। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর গায়ে সাইন্ বোর্ড আছে।"

আমি পথ ধরে—হন্‌হন্ করে চলে গিয়ে ডাক্তারের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়ালাম।

কালো একখণ্ড কাঠের উপর সাদা ইংরিজি হরফে লেখা,—ডাঃ জগদ্দুর্লভ দাস এইচ্-এল্-এম্-এস্। এইচ্‌টির আকার এল্-এর কাছে আণুবীক্ষণিক—যেন হাতীর পাশে পিঁপড়ে!

বুঝলাম ডাক্তার দাস হোমিওপ্যাথ। হোমিওপ্যাথির বিদ্যাই তাঁহার সম্বল; তবুও সেটাকে তিনি অগৌরব বলেই মনে করেন!

ডাক্ দিতেই দরজা খুলে একজন বৃদ্ধ বার হয়ে এলেন। হাতকাটা কুর্ত্তি গায়ে, পায়ে তালতলার চটি—পরণের কাপড় ঠ্যাঙে উঠেছে।

"কি চান আপনি?"

"আজ্ঞে, ডাক্তার বাবুকে।"

"আমিই জগদ্দুর্লভ ডাক্তার।"

"আপনাকে একবার দয়া করে ষ্টীমারে যেতে হবে—একটি ছেলের কলেরা হয়েচে।"

ডাক্তার ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লেন, "ষ্টীমারে।—ভিজিট অনেক বেশী পড়বে।"

"আজ্ঞে—অসহায় বিধবার ছেলে—একান্ত গরীব—ভিজিট্ তারা দিতে পারবে না।"

"তা'হলে আমায় ক্ষমা করতে হবে—ভিজিট্ না নিয়ে আমি এক পা বাড়াইনে—দয়া-ধর্ম্মের কাল চলে গেছে, মশাই!"

এই কথা শুনে হঠাৎ আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মনে হলো, দু'টো রূঢ় কথা বলে দি। কিন্তু ভগবানের কৃপায় রাগটা এত বেশী হয়ে পড়েছিল যে, মুখ দিয়ে কথা বার হলো না।

"কত টাকা হলে যেতে পারেন?"

"পাঁচ টাকা;—ডবল ভিজিট চার টাকা, আর এক টাকা কনভেয়ান্স।"

"আচ্ছা, আপনি প্রস্তুত হোন—আমি আস্চি।"

বিদ্যুতের মত একটা উপায় আমার মাথার মধ্যে চম্‌কে গেল। আংটিটা আমার হাতেই ছিল—এক টান মেরে সেটা খুলে ফেল্লাম।

পাশের বাড়ীতে সেকরার হাতুড়ীর ঠুক্-ঠাক্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এগিয়ে দেখ্‌লাম, সুতো-বাঁধা চশমা চোখে দিয়ে স্বর্ণকার এক মনে কাজ কর্‌চে।

বল্লাম, "দাদা, একটা বিপদ্ থেকে উদ্ধার করবে?"

"কেহ্ তুমি?"

"জাহাজের যাত্রী ;—একটি বিধবার ছেলের কলেরা হয়েচে—হাতে কিচ্ছু টাকা নেই—এই আংটিটা বেচে দাও ত ডাক্তার নিয়ে যাই।"

আংটিটা দেখে সে বল্লে,—"ভারি দামী জিনিস ;—এত দাম ত' আমি দিতে পারব না ;—এ কোন রাজ-রাজড়ার হাতের জিনিস। চোরাই নয় ত ?"

"নাঃ, সে ভয় নেই।—আমার ঠিক্-ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। কত টাকা তুমি দিতে পারবে ?"

"পঞ্চাশ।"

"আচ্ছা,—এক মাসের মধ্যে টাকাটা আমি পাঠিয়ে দিলে,—আংটিটা ফেরত দিও, দাদা।"

"বেশ কথা—তাই হবে।"

সেকরার মুখটি সৌম্য। হৃদয়ে দয়া আছে।

আমি মঠের নাম-ধাম লিখে দিলাম ; আর তার নাম-ঠিকানা লিখে নিলাম। বিষ্ণুদাস স্বর্ণকার—দবিরপুর গ্রাম, পোষ্টাফিস্ বোদড়া।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ডাক্তারের কন্‌ভেয়ান্স তৈরি। অর্থাৎ একটি পক্ষিরাজ অশ্বের পিঠে একটি জীর্ণ কম্বল বাঁধা —নেয়ারের ছিন্ন দড়ি দিয়ে।

আমি আস্‌তেই বল্লেন—"এই যে! ভিজিট্-টা ?"

পাঁচটা টাকা ফেলে দিয়ে বল্লুম—"চলুন, দেরী করবেন না।"

ডাক্তারের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই যাচ্ছি। ওরে টিবুরে, এই ওযুধের বাক্সটা নে।"

টিব্‌রে পক্ষিরাজটির রক্ষক।

অশ্ব মৃদু-মন্থর গতিতে ঘাটের পথে অগ্রসর হলো। ডাক্তার তার পিঠে অজস্র ছপ্‌টি বর্ষণ করে তার গতির কোন তারতম্য উৎপাদন করতে পারলেন না; প্রয়োজনও বড় বেশী ছিল না। আমরা অচিরে ঘাটে এসে উপনীত হলাম।

ছেলেটির অবস্থা দেখে সারেঙ্গের দয়া হয়েছিল। সে আমায় ডেকে বল্লে যে, "ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নাও—কত সময়ে সে সাম্‌লে দিতে পারবে; ততক্ষণ আমি দাঁড়াব—নঙ্গর ফেলিয়ে দিয়েছি।"

সন্ধ্যা তাগা-তাগি ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ঘুমোতে লাগ্‌ল। ডাক্তার অনেকবার ছুটাছুটি করেছিলেন—আরো দশটি টাকা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় দিলাম। তিনি যাবার সময় হৃষ্টচিত্তে বল্লেন—"কিছু মনে করবেন না—সকালে ব্যবহারটা কিছু কড়া হয়েছিল।"

সারেঙ্গ সব শুনেছিল—সে বল্লে,—"বাবুজি, গরীবের উপর দয়া রাখবেন;—তাতে খোদা তোমার ভালই করবেন।"

দবিরপুরের ঘাট ছেড়ে জাহাজ আবার গম্ভীর-নির্ঘোষে রওনা হলো—তখন রাত আট-টা হবে।

১১

উপরে গিয়ে দেখ্‌লাম, অমিয়া গালে হাত দিয়ে চুপ করে কি ভাবচে। আমি আস্তে-আস্তে তার পিছনে দাঁড়ালাম। সে এমন নিবিষ্ট ছিল যে কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না।

সমস্ত দিন উদ্বেগের পর মনটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ষ্টীমারখানা বিপুল বেগে চল্‌ছিল। যে সময়টা বৃথা দাঁড়িয়ে কেটেছে, তাকেই ধরতে যেন তার পিছনে এমনি করে উধাও হয়ে ধেয়ে যাওয়া। এই গতির সঙ্গে এমন একটা বিরাট্ শব্দ হচ্ছিল যে, মানুষের পায়ের শব্দ শুনা যায় না।

আমি ধীরে-ধীরে ডেকের উপর শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবলাম তার ঠিকানা নেই। সব চেয়ে বেশী ভাবলাম ছেলেটির কথা—ডাক্তারের কথা, আর সেই আংটির কথা। বিষ্ণুদাসের কাছে সেটা রইল্! এ ঋণ কি ক'রে পরিশোধ হবে। একবার মনে হ'ল, একে ঋণ বলি কেন? ও ত' আমার জিনিস! তাই কি? আমি কি নিতে পারি? কিসের দাবীতে আমি পেতে পারি—সে কিসের জোর! জোর নয়, জোর নয়, তবে? আমার সমস্ত দেহ আগুন হয়ে উঠ্‌ল—মনে হ'ল, কাণ ফুটে রক্ত বার হবে।

অমিয়া এসে পায়ের কাছে বসে বল্লে, "কি ভাব্‌চ তুমি?"

"কিছু না।"

"মিথ্যে কথা। বলবে না আমায়?"

হায়, কেমন ক'রে বলি—এ-সব যে বল্‌বার কথা নয়!

বল্লাম, "কি হবে শুনে?"

"জানিনে।" বলে সে ঘাড় ফিরিয়ে রাগ ক'রে বসে রইল,

"অমিয়া, রাগ ক'রেচ ?"

ঘাড় না ফিরিয়ে বল্লে,—"হুঁ।"

"একটা কথা শুন্‌বে ?"

"না।" বলে সে, হেসে ফেল্লে।

লীলাময়ীর লীলার ছন্দের তালে তাল রেখে চলা আমার মত রসহীন ব্রহ্মচারীর কর্ম্ম নয়।

সে বল্লে, "বল না কি বল্‌বে—আমি যে না-শুনে আর থাক্‌তে পারচিনে।"

"তুমি শুন্‌লে নিশ্চয় খুব রাগ কর্‌বে।"

"এমনি কি অন্যায় কাজ তুমি ক'রে এসেছ ?—হ'তেই পারে না। আচ্ছা বল্‌চি, কিছুতেই রাগ কর্‌ব না—এই তিন সত্যি করলুম।" বলে অমিয়া তাড়াতাড়ি তিনবার ব'লে নিলে—"রাগ কর্‌ব না—কর্‌ব না—কর্‌ব না—হলো ত' এবার ?"

উঠে বসে বল্লাম, "ভয় ক'রচে আমার বল্‌তে।" "ফের !" ব'লে সে দৃপ্তা ফণিনীর মত মাথা তুলে বল্লে, "তুমি ভারি দুষ্টুমি কর কিন্তু—আমার কিছু ভাল লাগে না।"

"কেমন ক'রে বলি ? আমার অপরাধ যে বড় মস্ত।"

"মস্তই হ'ক আর ছোট্টই হ'ক তোমাকে বল্‌তেই হবে—যদি না বল ত' আমি মাথা-মোড় খুঁড়ে মরব।"

আমি বল্লাম, "আংটিটা হারিয়ে গেছে।"

"ওঃ এই ! আমি বলি আর কি !—তোমার জিনিস তুমি হারিয়েছ—তাতে আমার কি ?—আমি কেন রাগ কর্‌তে যাব ? বাবা ! বাঁচলুম—আমি তাঁ আর নেই—ভেবেই মরি—কি এমন একটা ক'রে বস্‌লে তুমি :

আংটিটা আমার! কেন আমার? কিসের দাবী আমার ছিল তার উপর? এই প্রশ্ন বার-বার আমার মনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পাক্ খেয়ে ফিরতে লাগ্ল।

সত্যকে অস্বীকার করলে, মনটা মিথ্যার জাল, এমনি করেই, তার চারিদিকে বুন্তে থাকে—তাতে শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই!

কিন্তু সত্যকে গোপন রাখাও শক্ত—সে যখন বার হয়, তখন এক নিমেষে মিথ্যার জালকে ছিন্ন ক'রে দেয়।

আমি বল্লাম, "সত্যি বলচি অমিয়া সেটা হারায়নি—আমি বিক্রী করেচি।"

"বিক্রী? ছি—ছি! তা কর্তে গেলে কেন?"

"নিরুপায় হয়ে করেচি—তা' না হলে যে কিছুতেই ডাক্তার পাওয়া যেত না।"

"ওমা! এই তোমার মস্ত অপরাধ! এ ত খুব ভাল কাজ—ওর চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে? আংটিটা যদি একজনকে প্রাণ দিয়ে থাকে ত' সে যে ভারি আহ্লাদের কথা হয়েছে।"

মনের উপর থেকে একটা মস্ত ভার এক নিমেষে সরে গেল। এই মেয়েটিকে হঠাৎ যেন বিশ্বের সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার ভালবেসে ফেল্তে ইচ্ছা হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে তার সর্ব্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে ভরে দেবার বাসনা মনের মধ্যে জেগে উঠ্তেই, যেন মনের অন্তস্তল থেকে একটা সূক্ষ্ম তীব্র ধ্বনি চাবুকের শব্দের মত ব'লে গেল, "সন্ন্যাসী, পালা—পালা!"

আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম, "যাই, ছেলেটি কেমন আছে একবার দেখে আসিগে।"

অমিয়া বল্লে, "আমিও যাব দেখ্‌তে।"

আমি কথার উত্তর দিলাম না। সে আমার পিছনে-পিছনে আস্‌তে লাগ্‌লো।

কোথায় তুমি পালিয়ে যাবে ব্রহ্মচারি! তোমার পায়ে যে সোণার শিকল পরানো হয়েছে! যতই তুমি ছুট্‌বে, ততই সে বেজে-বেজে উঠে, তোমাকে এই বন্ধনের কথা নিত্য-নিয়ত মনে করিয়ে দেবে। যত দূরে তুমি যাবে,—ততই তার ফাঁস কঠিন হয়ে বেড়ে ধরবে তোমার চরণকে!

দোতলা দিয়ে নেমে যাবার সময় দেখ্‌লাম, সারেঙ্গ তুলসীদাসের রামায়ণটি খুলে সুর করে-করে পড়চে। তার সাক্‌রেদ্‌ পিছনে বসে চাকাটি ধরে আছে।

অভ্যাসের কি তাগিদই মানুষের মনের উপর! কাজের ধারা এমনি করেই আবর্ত্ত রচনা করে-করে অতীত থেকে বর্ত্তমানে—বর্ত্তমান থেকে অজানা ভবিষ্যতের পথে ধেয়ে চলেছে। যেখানে বাধা সেইখানেই কল-তরঙ্গের গভীর উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছে!

নীচে গিয়ে দেখ্‌লাম, ছেলেটি—রমাইচাঁদ সুস্থ হয়ে ঘুমোচ্চে,—মা তার কাছে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন—সমস্ত দিন উৎপাতের পর নিস্তরঙ্গ সমুদ্র যেমন ক'রে ধরণীর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে!

এরি মধ্যে রমাইচাঁদের মা আমাকে বাবা বল্‌তে সুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অমিয়ার সঙ্গে তার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

অমিয়ার মুখটি ভাল করে দেখে বিধবা বল্লে, "আহা! যেন স্বয়ং ভগবতী—এস মা, এইখেনে বসে আমার রমাইএর মাথায় তোমার চরণ-ধূলো দাও—সে বেঁচে উঠুক।"

অমিয়া একটু মুখ টিপে হেসে, সেখানেই বসে পড়ল। আমি সরে গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালুম।

তাদের ভিতর আস্তে-আস্তে কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি ভাব্‌লাম, কোথায় পালাই! হে ভগবন্‌, এ কিসের জালে এমন ক'রে আমাকে জড়িয়ে দিচ্ছ! মনটা শক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম; অমন ক'রে নুয়ে পড়লে ত চল্‌বে না। এ কঠোর সংগ্রামে সেপাইএর মত বুক উঁচু ক'রে খাড়া হয়ে লড়াই কর্‌তে হবে। কিসের লড়াই? কার সঙ্গে?

দেখ্‌লুম, অমিয়া হেসে গড়িয়ে পড়চে। ফিরে চাইতে—সে হাত-ছানি দিয়ে ডেকে বল্লে, "শোন—শুনে যাও না।"

কাছে যেতেই বল্লে, "এই শোন, ইনি কি বল্‌চেন।"

বিধবাটি ধীরে-ধীরে বল্লে, "তাই বল্‌ছিলাম বাবা, সত্যবানের মত সোয়ামি পেয়েছ মা,—চিরদিন হাতের নো—মাথার সিঁদূর বজায় রেখে ভাগ্যবতী হয়ে বেঁচে থাক। আমরা জেতে সেক্‌রা—এর চাইতে আর কি বল্‌তে পারি!"

অমিয়া হেসে গড়িয়ে গেল। কি দুষ্টুমিই তার হাসিতে ছিল!

লজ্জায় আমার মুখ-চোখ গরম হয়ে উঠ্‌ল; বল্লাম—"কি ছেলেমানুষি কর্‌চ, এখুনি রমাই উঠে পড়বে যে! এস, উঠে এস।"

রমাইএর মা গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বল্লে, "এস গিয়ে মা। আর বাবা, তোমায় আর আমি কি বল্‌বো—আর জন্মে তুমি আমার বাপ ছিলে নিশ্চয়।"

আমরা উপরে উঠে এলাম।

১২

মার কোল শূন্য ক'রে রমাইচাঁদ চলে গেল! আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, তার মাকে অকূলে ভাসিয়ে এমন ক'রে যাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল, কে বল্‌বে?

শেষ-রাত্রে বার-দুই ভেদ-বমির পর সে মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়্‌ল। নীচে গিয়ে দেখ্‌লাম, তার নিস্পন্দ দেহখানা জড়িয়ে ধরে, তার মা চীৎকার ক'রে কাঁদচে—"কোথায় চলে গেলিরে আমার বাপ-ধন!"

মৃত্যু যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ এসে পড়বে—তা' কেউ ভাব্‌তে পারেনি। তাই সকলেই গভীর বিপদে যুগপৎ নির্ব্বাক্ হয়ে গেল!

কেউ রমাইএর মার কাছে পর্য্যন্ত যেতে সাহস কর্‌ছিল না। আস্তে-আস্তে গিয়ে পাশে বস্‌তেই তার কান্না দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। "বাবা, তোমরা কেউ আমার রমাইকে ধরে রাখ্‌তে পার্‌লে না!—তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনে দাও। কোথায় গেলিরে আমার চক্ষের মাণিক, বক্ষের নিধি—ওরে আমার বাপ্,—তোকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাক্‌বো। ওগো, তোমরা আমায় তার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

বুকের মধ্যে সমস্ত অশ্রু জমে পাথরের মত ভারি হয়ে গেল। চুপ্ ক'রে বসেই রইলাম। একটা সান্ত্বনার কথাও মনে এল না।

বৃদ্ধ এসে পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে, "কি হবে আর কান্নাকাটি, হাই-হুতাশ ক'রে—যে যাবার সে চলে গেছে। বয়স হয়েচে ঢের, দেখেচ ত,

যায় সে আর ফেরে না। আমি তখনি বুঝেছিলাম—যাকে কালে ছোঁয়, সে আর ফেরে না। এখন ছেড়ে দাও লাশখানাকে—ওটা মাটির পুতুল—ওর সদ্‌গতি কর্‌তে দাও। সমস্ত জীবন রইল—যত পার কেঁদ—কেউ তোমাকে মানা করবে না।"

হুঁকোয় বার-দুই টান দিয়ে বৃদ্ধ আবার বল্লে, "আর জন্মে মা, ও তোর পরম শত্রু ছিল—নইলে এমন করে ধনে-প্রাণে মেরে রেখে যায়। এ ঘোর কলি—নইলে এমনটা ঘটে? বুড়ী না মরে মর্‌লো কি না দুধের ছেলেটা গো! রাম—রাম, আমাদের মরাই ভাল। কালে কালে কতই দেখ্‌তে হবে!"

কি হৃদয়হীন কথা! এমন করে তারাই বল্‌তে পারে, যারা হৃদয়ের ধন হারিয়ে মনটাকে পাষাণ করে ফেলেচে। বৃদ্ধ অবিচলিত ভাবে এই-সব বলে গেল—একটা দীর্ঘ-শ্বাসও ফেল্লে না!

দুপুরবেলায় রমাইএর মাকে অমিয়ার কাছে দিয়ে এলাম। তার পর আমাদের কঠিন কর্ত্তব্য সুরু হলো।

যাত্রীদের ভিতর কেউ রমাইএর শব ছুঁতে রাজী হলো না;—জাত যাবে!

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি এল! এই জাত বুঝি দেশের লোক ধুয়ে খায়! গোপনে পাপাচরণ করলে এ জাত যায় না! যা-কিছু বাধা সৎ-কর্ম্মে!

এত নির্ব্বোধ নিশ্চয়ই প্রণম্য মুনি-ঋষিরা ছিলেন না। লোকাচার ভগবানকে ভূত করেচে! ঘৃণায় আমার মন বিষ-তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

সারেঙ্গ বল্লে, "কেউ না ফেলে, জাহাজের মেথর ফেলবে।"

এই কথাটা আমার বুকে ধড়াস করে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল।

বল্লাম, "সারেঙজি আমিত ফেল্‌তে প্রস্তুত আছি। জমাদারের প্রয়োজন হবে না।"

সারেঙ্গ আমার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। কি তার মনে হলো জানিনে। শেষ কালে বল্লে, "বেশ, তাই হবে।"

রমাইএর নশ্বর দেহটিতে কঠিন বন্ধন দিয়ে, একটা কলসীর সঙ্গে বেঁধে—ষ্টিমার থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কলসীটা যেন কত বকা-বকি করে জলে ভরে গিয়ে তলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে বিধবার হৃদয়-পুত্তলিও তলিয়ে গেল। যাত্রীরা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করলে, 'বলো হরি, হরি বোল!'

বাস্—সব শেষ হয়ে গেল তার! যে শেষ মানুষের এত কাছে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে, তাকে মনে করতে আমাদের কত ভয়! ভয়ই কর, আর ভালই বাস, নির্দ্ধারিত সময়ে সে তোমার কেশে ধরবেই ধরবে!

সারেঙ্গ একটা নতুন কাপড় দিয়ে বল্লে, "ওটা বদ্‌লে ফেল, মহারাজ!"

স্নান করে নূতন বস্ত্র পরে যখন ডেকের উপর এসে দাঁড়ালাম, তখন আমার মন বৈরাগ্য-রসে পরিপ্লুত!

সারেঙ্গ দৌড়ে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পায়ের ধূলো নিতেই, দলে-দলে যাত্রীরা এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল!

এ কার সম্মান করচে এই মানুষগুলো? আমার? আমার এই হাত, পা, নাক, কাণের? কখ্‌খনো না। এই প্রণতি শিবম্ পাচ্ছেন—যিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে অহরহঃ জন্ম গ্রহণ করচেন। মানুষ! লুটিয়ে দাও তোমার মাথা তাঁর পায়ে যিনি সত্য, যিনি শিব—যিনি সুন্দর!

ভালো কাজের পুরস্কার নেই কে বলে? 'কার এত বড় সাহস! পুরস্কার চারিদিকে রাশিরাশি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌চে। তাকে অনুভব করবার হৃদয় চাই—তাকে খুঁজে নেবার বুদ্ধি চাই—ধৈর্য্য চাই!

উপরে যেতেই বিধবা হাহাকার করে কেঁদে উঠে, ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে।

"বাবা, আজ থেকে তুমি আমার রমাইএর জায়গায় হলে। তুমি আমার পেটের সন্তান; বল, তুমি এ অনাথাকে আশ্রয় দেবে?"

বুকের বরফ গলে চোখ দিয়ে উছ্‌লে পড়ল! এ কি আবার নূতনতর বাঁধনে বাঁধচ, ভগবন্! মুক্তির পিছনে বন্ধনকে এমনি করেই কি লেলিয়ে দিতে হয়! কি যে চাও তুমি, একদিনের জন্যেও কি বুঝ্‌তে দেবে না?

১৩

দুটো বনের পাখী এক শিকলে বাঁধা পড়ল বুঝি! শৈশব থেকে আমরা দু'জনেই মা-হারা! নির্ঝরের এত কাছে এসে কে না চিরদিনের পিপাসা আকণ্ঠ পূর্ণ করে মিটিয়ে নেয়?

পান্থ-পাদপের গায়ে আঘাত করলে যেমন রসের ধারা ক্ষরিত হতে থাকে, এই রমণীটির আহত হৃদয় থেকে স্নেহের স্ফটিক-নির্ম্মল ধারা ঠিক তেমনি নিঃসৃত হচ্ছিল। তার হৃদয়ের বহুদিনের শূন্যতা যেন এক নিমেষে কে পূরণ করে দিয়ে গেল!

বিধবার সাত ছেলে, তিন মেয়ের—শেষ আলোটি রমাই জ্বালিয়ে রেখেছিল। সেই ক্ষীণ শিখাটি কেমন করে কালের ফুৎকারে সেদিন চকিতে নিভে গেলে—আমরা দেখেছি। দিনের আলো চলে গেলে মানুষ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রির অন্ধকার দূর করে; বিধবার অন্ধকার হৃদয়-কক্ষে এও যেন তেমনি হলো। এই দুটিকে জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে নারী-হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-তৈল যে প্রচুর পরিমাণেই ঢেলে দেওয়া হয়েছিল—তা আমরা পলে-পলে, বর্ণে-বর্ণে অনুভব করতে পারতাম।

হরিপুরে বিধবার নেমে যাবার কথা। একদিন আগে থেকেই আমাদের উপর হুকুম হলো যে, আমাদেরও সেই সঙ্গে যেতে হবে। সে যে কি অনুরোধ, কেমন করে বলি!

সেদিন সকালে অমিয়াকে নিভৃতে ডেকে বল্লাম, "কি করা যায়?"

"করবে কি?—যেতে হবে।"

"তুমি যাও—আমাকে ছেড়ে দাও না হয়।"

"সে রকম কথা ত' মহাভারতে লেখা নেই!"

"সে আবার কি?" আমি অবাক্ হয়ে গেলাম।

"কেন, সত্যবানকে ত সাবিত্রী ছেড়ে দেয়নি!"

আমি বল্লাম, "সত্যি বল্‌চি অমিয়া, ঠাট্টা ছাড়—আমার মন মঠে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েচে।"

"মঠে? তুমি ত আর ব্রহ্মচারী নও—মঠে গিয়ে তোমার কি হবে?"

লজ্জায় আমার মাথা যেন আপনি নুয়ে পড়ল—সে-রাত্রির ঘুমন্ত মুখখানি ধীরে-ধীরে মনের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল। কি উত্তর দেব—ভেবেই পেলাম না! গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বল্লাম, "অমিয়া,—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে' আমাকে ক্ষমা কর।"

খুব সহজ ভাবে সে বল্লে, "অপরাধ কি তা ত জানিনে,—বল, ভেবে দেখি, ক্ষমা করা যায় কি না।"

অমিয়ার মুখের উপর চোখ ফেলে দেখ্‌লাম, তার লাল ঠোঁট-দুটির মাঝখানে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসিটি—আগুনের উপর হাওয়া যেমন করে কাঁপে—ঠিক তেমনি কাঁপ্‌চে।

চুপ করে থাকাও, মনে হলো, ঠিক নয়—তাই বল্লাম, "তার কি কোন হিসেবপত্র লেখা-জোখা আছে—সে যে অনেক;—কেমন করে বলি?"

"নিদেন একটাও—যার কথা তোমার সব-চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে এখন।"

"সে আমি বল্‌তে পারিনে তোমায়;—কি হবে শুনে?"

"যে অপরাধ কথায় বল্‌তে পারা যায় না, তা নিশ্চয়ই খুবই বড়—ত আমি ক্ষমা করতে পারিনে।"

"তা হলে শাস্তি দাও আমাকে—আমি মাথা পেতে তা নিতে রাজী আছি।"

"তাই হোক্ তা'হলে—এই বিধান বাহাল হলো যে, তোমাকে আমার সঙ্গে-সঙ্গেই থাক্‌তে হবে—আর সম্প্রতি যে আমি মেয়ের বাড়ী যাচ্চি, তার সব ব্যবস্থা অচিরে তোমারই করে দিতে হবে।"

"আমি যে নির্ব্বাসন-দণ্ড চাই।"

"প্রাণ থাক্‌তে আমি তা তোমাকে দিতে পারব না—মানুষের উপর গুরুদণ্ড—সে আমাদের বিচার নয়—সে পুরুষের হৃদয়হীন বিচার।"

"অমিয়া—তুমি জান না—"

"জানি, আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমার চেয়ে তোমার মঠ বড়। কিন্তু কেন তুমি আমাকে বাঁচালে—আমি ত ডুবেই ছিলুম।"

পরিহাসময়ীর স্বরটা হঠাৎ ভারি হয়ে গেল—চোক দুটো ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌ল—সে ঠিক যেন বর্ষণোন্মুখ মেঘ।

"আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পাবে না।" এ কথার ভিতরে হৃদয়ের একটা গভীর কাতরতা ছিল। তাকে 'না' করা বড় শক্ত।

"আচ্ছা, তাই হবে।"

অমিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল; মেঘের পর রৌদ্র যেমন করে দীপ্ত হয়ে উঠে!

আমি উন্মনা হয়ে বসে-বসে মাথা-মুণ্ড কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম। খাঁচার পাখীর কথা মনে হলো। পাখা-দুটি যখন বদ্ধ হয়ে যায়, তখন নীল আকাশের মুক্তিটি কল্পনা দিয়ে কেবল উপভোগ করবার বস্তু হয়ে পড়ে সে বেচারির। তেমনই বুঝি হয়ে পড়চে আমার।

অমিয়া বল্লে, "কত কষ্ট দিচ্চি তোমায়—অপরাধ নিয়ো না, লক্ষ্মীটি আমার।"

হাস্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম।

অমিয়া বল্লে, "মেয়ের আমার যা-কিছু জমি-জরাৎ, বাড়ী-ঘর আছে—তার একটা ব্যবস্থা করতে আর কতদিনই বা দেরী হবে? তার পর আমরা কল্‌কেতা চলে যাব।"

"সেখেনে গিয়ে ত ছাড়া পাব?"

"পাবে বৈ কি? কেউ কাউকে কি বেঁধে রাখ্‌তে পারে?"

শুনে আশ্বস্ত হলাম। এতদিন কেটেচে—আর কটা দিন বই ত নয়।

আমরা একটা বেঞ্চের উপর বসেছিলাম,—রমাইএর মা এসে আস্তে-আস্তে আমাদের পায়ের কাছে বস্‌ল।

"কখন গিয়ে আমরা হবিপুর পৌঁছব, বাবা?"

"ষ্টীমারের কথা কিছুই বলা যায় না—সারেঙ আন্দাজ করে, বেলা তিনটে হবে।"

"তা'হলে বাড়ী যেতে রাত হয়ে যাবে। তাই ভাব্‌চি, অত রাতে কি তোমাদের খেতে দেব। ভূনি ময়রাণীর দোকান তখন বন্ধ হয়ে যাবে।"

অমিয়া বল্লে, "এক রাত্তির না খেয়ে কিছু কেউ মারা যাবে না মেয়ে;—কেন তুমি অত মিছিমিছি ভাব্‌চ। সে একরকম হয়েই যাবে।"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম,—"সে একটা কিছু হয়েই যাবে,—উপোস করে থাক্‌তে হবে না নিশ্চয়।"

"তাই ত, বড্ড অসময় হয়ে পড়বে—তাই ভাবৃচি মা।"

অমিয়া বল্লে, "এক কাজ করি,—খুব দেরী করে সকালের রান্না শেষ করব—আমাদের খেতে-দেতেই বেলা দুটো হবে তা'হলে।

আমি বল্লাম, "রান্নাটা না হয় আমিই করিগে,—অনভ্যস্ত হাতে দেরী আপনি হবে,—আর রাঁধুনীর ক্ষিদে পায় না—সেই বেশ হবে।" রমাইএর মা বল্লে, "না বাবা, তাতে কাজ নেই—শেষ পর্য্যন্ত যদি না হয়ে উঠে ত' তার চাইতে আর বিপদ্ কি বড় হবে? আজ আর তোমার কিছু করে কাজ নেই।"

বিধবা উঠে অন্যদিকে চলে গেল।

অমিয়া বল্লে, "দেখ ত, 'না' বলা কি যায়? এত যার আগ্রহ, তাকে 'না' বলাটা পাপ। তা ছাড়া, আমাদের পেয়ে ওর পুত্রহারা প্রাণের হাহাকারটা থেমে আছে। আমরাই যে তার এখন অবলম্বন হয়েছি। এই অবলম্বন সরিয়ে নিলে, কি তার অবস্থা হবে, ভেবে দেখেচ কি?"

আমি বল্লাম, "ভেবে আর করব কি? আর, যার ভাব্‌বার লোক আছে, তার জন্যে মিছে ভাবনা করা আমার অভ্যাস নয়।"

সে হেসে বল্লে, "তোমাদের ভাবনার জন্যে ত এই বিশ্ব, এই সমস্ত দুনিয়া রয়েচে—এত ছোট-খাট বিষয়ে এত বড় শক্তির নিয়োগ তোমরা কর না বটে!"

কথার ভিতর শ্লেষ ছিল কি না, জানি না; কিন্তু শুনে যেন মনটা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল।

বল্লাম, "তা ঠিক নয়। মিছে ভাবনা করিনে আমরা।"

সে বল্লে, "এক হিসেবে সব ভাবনাই ত' মিছে; মানুষ ভেবে কি

কর্‌তে পারে? আর, মানুষের জন্যে যে একজন আছেন, সে কথা তোমরা ভুলে যাও কেন?"

"সে কথা সত্যি—হার স্বীকার কর্‌চি।"

অমিয়া প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল, "কারুকে হারিয়ে দিয়ে আমার ভারি দুঃখু হয়, মনে হয় আমরা অধিকার-চ্যুত হ'য়ে পড়্‌চি।"

"তোমার চোখ দেখে ত সে দুঃখের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।"

"তা'হলে চোখেরাও যুধিষ্ঠির।" ব'লে, সে তর্কের জালটাকে নিমেষে কোথায় উধাও ক'রে দিয়ে, একটা খোলা হাসি হেসে উঠ্‌ল।

শুক্‌নো গাছের পাতাগুলো কেমন শুকিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে,—অল্প হাওয়াতে নড়েও না, চড়েও না—আমার মনটা ঠিক্ তেমনি ক'রে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল। অমিয়ার হাসির বাতাস তাতে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু দুলিয়ে দিয়ে যেতে পার্‌লে না।

সে বল্লে, "দিনকতক জলের হাওয়া খুব খেয়ে নেওয়া গেল,—এখন আবার কিছুদিন ডাঙ্গার হাওয়া খাওয়া যাক্ না কেন?"

বল্লাম, "আচ্ছা অমিয়া, তোমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয় না?"

"ভয় করে, সেখানে যেতে। যদি গিয়ে দেখি, বাবা নেই!"

এমনি করেই মন আত্ম-রক্ষা কর্‌তে চায়! এ যেন ব্যথার উপর ছেঁড়া ন্যাকড়ার পটি,—যতক্ষণ এমনি ক'রে চলে যায়!

বুকের ব্যথা যারা মুখের হাসি দিয়ে চেপে রাখ্‌তে পারে, তাদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই একটু অসাধারণ গোছের। আজ হঠাৎ এই কথাটা জান্‌তে পেরে, আমার মনটা অমিয়ার প্রতি সহানুভূতিতে ভ'রে গেল!

মানুষের মনের সাধারণ চেষ্টা,—একটা জিনিসকে জেনে নিয়ে শেষ ক'রে ফেলা। এ তা নয়। একটা জিনিসকে না জেনে ঠেলে রাখ্‌বার ক্ষমতা সকলের থাকে না। তাতে যে অনেকখানি সংযমের প্রয়োজন। সে সংযম এই মেয়েটি পেলে কোত্থেকে!

পরের চিঠি পড়তে নেই, সে ত সকলেই জানে; কিন্তু হাতে চিঠিখানা এসে পড়লে, ক'টা লোক না পড়ে' নিরস্ত থাকতে পারে? যে থাকে, সে জানে, কতখানি জোর দিয়ে পড়বার আগ্রহটাকে দমিয়ে রাখ্‌তে হয়।

যদি অমিয়াকে ভাল ক'রে না জান্‌তুম, তা'হলে নিশ্চয়ই মনে হ'ত, সে হৃদয়হীন; কিন্তু তার হৃদয়ের পরিচয় আমার কাছে অবিদিত নেই! আমি ত বিস্মিত হ'য়ে গেলাম তা'র এতখানি শক্তি দেখে। প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ যেমন বড়, তার প্রশান্তিও তেমনি গম্ভীর!

১৪

সূর্য্যদেব অস্তাচলে চলেছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে হবিপুরের ঘাটে পৌঁছলাম। একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘের পিছনে লুকিয়ে পড়ে যেন তিনি হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিলেন। অন্ধকার হয়ে পড়্‌ল। ফাটা মেঘের ফাঁকে কোহিনুরের মত সাঁঝের তারা ঝিক্‌-মিক্‌ করে উঠ্‌ল। জলের উপর তার ছায়া পড়ে, একটা কালো কষ্ঠি-পাথরের উপর পাকা-সোনার আঁচড়ের মত দেখাতে লাগ্‌লো।

এবার বিদায়ের পালা। সারেঙ্গ, খালাসি—সবাই এসে আমাদের কাছে দাঁড়াল। আমাদের চোখ জলে ভরে এলো। বুকের মধ্যেটা আন্‌-চান্‌ করে উঠ্‌ল!

এই মানুষের মায়া! দু'দিনের জন্যে কাছা-কাছি এসে এমন বাঁধনে মনটা জড়িয়ে পড়ে যে, তাকে কাটবার সময় সমস্ত হৃদয়টা ব্যথিত হয়ে উঠে।

সারেঙ্গ বল্লে, "মহারাজ-জী, আমাদের ভুলে যেও না!"

হাসির চেয়ে কান্নাটাই যেন ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল; কিন্তু তবুও হাস্‌তে হ'লো। বল্লাম, "তোমার দয়ার কথা জীবন-ভর মনে থাক্‌বে সারেঙজি—তবে অনেক অপরাধ উৎপাত করেছি, সেগুলো তোমরা মনে নিও না।"

সবাই হাস্‌লে; কিন্তু সেই হাসি, কান্নার চেয়ে করুণ—মনের পাথর ফেটে যেন তা নিঃসৃত হচ্ছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আস্তে-আস্তে ষ্টীমার থেকে নেমে এসে মাটির

উপর দাঁড়ালাম! মনে হ'লো, পুরোনো আবাসভূমি ছেড়ে আবার যেন নব-জীবন আরম্ভ হ'লো। এ যাত্রার কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কে জানে!

একখানি গরুর-গাড়ী ভাড়া করে, তার ছইএর ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে তিনজনে বস্‌লাম। গাড়ীখানা—আমাদের মনের মধ্যে যে কান্নার ধ্বনিটা নিঃশব্দে আছাড় মার্‌ছিল,—তারি অনুরূপ বিষাদময় শব্দ কর্‌তে-কর্‌তে গ্রামের পথে এগিয়ে চল্‌ল।

রমাইয়ের মা বসে নীরবে চক্ষের জল ফেল্‌ছিল। অন্ধকারে তা না দেখ্‌তে পেলেও, আমরা মন দিয়ে তা স্পষ্ট অনুভব কর্‌ছিলাম।

এরি মধ্যে গ্রামের পথ নিশুতি হয়ে গেছে,—কোথাও একটি জন-মানবের সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত নেই। গ্রামের মধ্যে এসে পড়লেই কেবল যমের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুকুরের মত কালো কুকুরগুলো ভয়ঙ্কর চীৎকার ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক-একটার শব্দ,—বাসন-বিক্রী ক'রে বেড়ায় যে কাঁসারি,—তাদের কাঁসরের চেয়েও বেশী গম্ভীর, আর ভঙ্‌-ভঙে! হঠাৎ ডেকে উঠ্‌লে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

শকটের চালক মধ্যে-মধ্যে বলদ দু'টের সঙ্গে প্রেমালাপ কচ্ছিল। সে দু'টোর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা সব সময়েই যে মধুর তা' ভুলে যাবার আমাদের অবসর ঘট্‌ছিল না। চাকাগুলোর করুণ-তীব্র আর্ত্তস্বর—সেই স্তব্ধ গ্রামের পথটিকে মুখর ক'রে, বাঁশ-গাছের মাথার উপর প্রতিধ্বনিত হয়ে, অনন্তের পথে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। সেই শব্দে ঘুমন্ত বকগুলো জেগে উঠে, পাখা ঝট-পটিয়ে পরিত্রাহী চীৎকার ক'রে উড়ে-উড়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলে যাচ্ছিল।

আমরা তিনজনে ভিতরে বসে নির্ব্বাক্‌, নিস্পন্দ। রমাইএর মার

নীরব শোকের ধারাতে আমরা দু'জনে যেন উপনদীর মত নিঃশব্দ অশ্রুর জোগান্ দিয়ে চলেচি। কথা বলে' সেই নিস্তরঙ্গ স্রোতে ক্ষুব্ধতা আন্‌তে ইচ্ছা হয় না,—সাহসে কুলোয় না!

অমিয়া খানিক পরে চুল্‌তে আরম্ভ করাতে, রমাইএর মা তা'কে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে—খালি বুকটা ভরিয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌লে। আমার মনটা ঝিঁঝিঁর শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঝিম্-ঝিম্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

গ্রামের পথ কোথাও উঁচু আবার কোথাও নীচু। নীচের দিকে নাম্‌বার সময় গাড়ীখানা পথ সংক্ষেপ করে গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল—তার ঝাঁকুনির আন্দোলনটা আমাদের হাড়ের মজ্জা পর্য্যন্ত ঠেক্‌ছিল।

পথ ক্রমেই বন্ধুর হয়ে উঠ্‌ল। আর শুয়ে থাকে কে? অমিয়া উঠে বসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"তোমার খুব কষ্ট হচ্চে—একটু শোও না।"

তার কোলটি বিস্তৃত করে দিয়ে বল্লে,—"এইখানে শোও না।"

"নাঃ, থাক্—থাক্।"

আমার কাণের কাছে মুখটা নিয়ে এসে বল্লে,—"লজ্জা করে বুঝি?" তার নিশ্বাসের গরম হাওয়াটা আমার গালের উপর দিয়ে ব'য়ে গেল।

"লজ্জা কাকে?—মেয়েকে?—আমি মেয়েমানুষ, আমার নেই লজ্জা —আর তোমার এ কি?"

সে আমার হাতখানা টেনে নিতেই—মা-হারা ছেলে যেমন ক'রে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি ক'রে শুয়ে পড়্‌লাম।

অমিয়ার গরম কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে আমার চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়্‌ল।

সে বল্‌ত যে, স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বিরোধই বেশী। তাদের অনৈক্যের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে নেয়। সে কেমন? স্রোতের মুখে দুটো হাঁড়ি ভেসে যাচ্চে—তারা অমনি ভেসে যাবে না—দু'টোতে টোক্কর খেতে-খেতে একবার কাছে একবার দূরে, এমনি করে ভেসে যাবে। স্ত্রী-পুরুষের যে আকর্ষণ সেটা যে কিসের, তা তারা জানে না। জানেন কেবল প্রকৃতি ঠাকৃরুণ—যিনি এই বিশ্ব-জগৎকে নিত্য-নিয়ত কেবলই রহস্যময় ক'রে তুল্‌চেন। স্ত্রী চায় পুরুষের সংস্পর্শে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রে নিতে, পুরুষ চায় বাসনার ক্ষুধাকে নিবৃত্ত কর্‌তে। চন্দ্রনাথ একে কিছুতেই প্রেম বল্‌তে চায় না। সে বলে যে, স্বামী যতক্ষণ না তার স্ত্রীকে মেয়ের মত, মার মত, ভগ্নীর মত ক'রে ভালবাসতে পারে, ততক্ষণ সেই মিলনের মধ্যে দাহ থাকবেই থাক্‌বে।

বাস্তবিক দেখ্‌লাম তাই—যেমন মনে ক'রলাম যে, অমিয়ার অন্তরের মাতৃত্ব আমাকে আহ্বান ক'রে তার কোলটি পেতে দিয়েছে—অমনি একটা পরম শান্তিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

পুরুষের কি অধিকার আছে, নারীকে সমস্ত বিশ্বজগতের যোগ থেকে এমন ক'রে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজের অঙ্কলক্ষ্মী বলে ভেবে নেবার? নারীর আদি-অন্ত, অন্তর-বাহির যে মাতৃত্বের স্নেহ-রসে অনুক্ষণ ওত-প্রোত!

কিন্তু আর কিছুতেই শুয়ে থাকা গেল না,—এমন গাড়ীখানা অস্থির হয়ে উঠ্‌ল।

উঠে বসে বল্লাম, "সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল—আমার ঘুমিয়ে কাজ নেই।"—অন্য সময়ে হ'লে অমিয়া হয় ত খুব হেসে উঠ্‌ত; কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

রমাইএর মা স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল, বল্লে, "বাবা, আর বেশী দেরী নেই—এই মাঠটা পেরিয়ে গেলেই আমাদের গাঁ। তোমাদের কত কষ্ট দিচ্চি।"

অমিয়া বল্লে, "এ আবার কষ্ট কি মেয়ে? পাড়া-গাঁয়ের পথ ত' এমনই হয়। আর গরুর-গাড়ী ত মোটর নয়। এ সব আমার সওয়া আছে।"

রমাইএর মা বল্লে, "আমি ভাবচি, কি তোমাদের খেতে দেব মা——এত রাতে ত গ্রামের কেউ জেগে নেই।"

আমি হেসে বল্লাম, "এ ভাবনা ত' তোমার আজ সকাল থেকে লেগেই রয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা উপোস ক'রে থাক্‌ব না—একটা কিছু উপায় হবে।"

অমিয়া বল্লে, "ধন্যি তোমরা সন্নেসী—একবার কি মুখে আন্‌তে পা'রলে না যে—না হয় নাই হ'লো আজ রাতে।"

বল্লাম, "তা মনে ক'রতে যাব কেন? আমরা যে দয়াময়ের রাজ্যে বাস করচি—যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অন্ন যোগাচ্চেন—তিনিই যোগাবেন। এ বিশ্বাস যদি না থাকে ত' সন্ন্যাসীদের চলে কি করে! আমাদের যে সঞ্চয় ক'রতে নেই। যা পেলাম খেয়ে-দেয়ে—তা বিলিয়ে দিতে হয়।"

অমিয়া বল্লে, "বিশ্বাস আর সত্য যদি এক হতো, তা'হলে এই দুনিয়াতে আর দুঃখ থাকৃত না। দেখি কি হয়, সন্ন্যাসীর বিশ্বাস বুঝি বা আজ অটুট থাকে না।"

বল্লাম, "তা হতেই পারে না। তুমি বুঝি একটা গল্প জান না—তবে শোন।"

অমিয়া শুনতে লাগ্‌ল।

"এক সন্ন্যাসী এক গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষে ক'রতে গেছে। ঘরে বুড়ী-মা আর যুবতী কন্যা ভিন্ন তখন কেউ ছিল না। মা রাঁধ্‌ছিলেন, হাত জোড়া ছিল, অগত্যা মেয়েটিকেই ভিক্ষা দিতে যেতে হ'লো। মেয়েটি তার সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢেকে সন্ন্যাসীর সাম্‌নে যেতেই, সন্ন্যাসী মেয়েটিকে বল্লে, মা, তোর ঐ কাপড়ের মধ্যে কি লুকোন আছে?"

এই কথা শুনে মেয়েটি ত কেঁদে কেটে অনর্থ করলে।

এদিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষা না পেয়ে চলে যায় দেখে, বুড়ী ছুটে এসে ভিক্ষা দিয়ে বল্লে—"বাবা, মাথায় জটা পরেছ—গায়ে ছাই মেখেছ—কিন্তু এ তোমার কি ব্যবহার?—মেয়েটিকে তুমি অমন করে অপমান ক'র্‌লে কেন?"

সন্ন্যাসী বল্লে, "মা, সত্যি বলচি, আমি কোন অপমান করিনি—আমার জান্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল—তাই জিজ্ঞেস্‌ করেছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে যে, কেন তোর মেয়েটি অমন করে উঠ্‌ল।"

সন্ন্যাসীর সহজ-সরল ভাব দেখে বৃদ্ধার বিশ্বাস হলো যে, সে কপট আচরণ কর্‌চে না।

বৃদ্ধা বল্লে, "বাবা, এত জান, আর এ জান না? ভগবানের ভাঁড়ারে, যে ছেলে এখনো জন্মায়নি তারো আহার জোগান রয়েচে যে!"

সন্ন্যাসী ভাব্‌তে ভাব্‌তে কতকদূর গিয়ে ভিক্ষার চালগুলো ফেলে দিলে। কাজ নেই তাতে। যে এখনো জন্মায়নি তার খাবার এত ব্যবস্থা—আর আমি বেটা দোরে-দোরে এক মুঠোর জন্যে লালায়িত! এ দেহ আর রাখ্‌ব না।

এই বলে সন্ন্যাসী একটা পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে গিয়ে পড়ে রইল। একদিন যায়, দু'দিন যায়; সন্ন্যাসী স্থির কর্‌লে, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—কিন্তু অন্নের অন্বেষণ কিছুতেই কর্‌বে না।

ক্রমে তার সংজ্ঞা লোপ হয়ে যাবার উপক্রম। ক'দিন পরে,—ঠিক সে তা বুঝতে পারলে না—হঠাৎ দেখে যে, তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে এক বুড়ী বল্‌চে "বাবা, খেয়ে নে।" উঠ্‌বার ক্ষমতা নেই। বুড়ী তার মুখের মধ্যে খানিকটা খিচুড়ী তুলে দিয়ে গেল। আর কাণের কাছে বলে গেল যে—"তুমি ত বাবা শিশুর মত অসহায় নও—এ আবদার সইবে না তোমার—হাত পা দিয়েছেন, খুঁজে খেতেই হবে।"

সন্ন্যাসীর চটক ভাঙ্গল। সে সব বুঝে, পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এল।

অসহায় অবস্থায় ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর উপর নির্ভয় কর্‌লে—তিনি উপায় করেই দেন।

এর পর আমরা কেউ কথা কইলাম না। আমার মনের মধ্যে এই নির্ভরের প্রসঙ্গ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

নির্ভর করবে কে? মানুষ কি বাস্তবিক ভগবান্‌কে মানে? ভগবানের সব প্রসঙ্গই মানুষের বাক্যের মধ্যে নিবদ্ধ—ক'টা লোক তাঁকে অন্তরের সঙ্গে মানে!

প্রতি পলে, প্রতি পদে আমরা আত্মশক্তি জাহির কর্‌তে ব্যতিব্যস্ত! মানুষ বহুপূর্ব্বে ভগবান্‌কে তাঁর সিংহাসন-চ্যুত করে নিজেকে তার উপর বসিয়ে রেখেচে! আমরা যে সবাই সোঽহং স্বামী!

১৫

রহিম চাচা প্রতিবেশী। কুকুরের ডাক, লোকজনের কথা-বার্ত্তা এবং গরুর-গাড়ীর বিকট্ ক্যাঁচ-ক্যাঁচানি শুনে, হাতে একটা কেরোসিনের মিট-মিটে ডিবে নিয়ে বার হয়ে এল। বয়স, পঞ্চাশের কোটা শেষ করে ষাটের দিকেই। নেড়া মাথা, খুদি-খুদি করে গোঁফ ছাঁটা—কাঁচা-পাকা বিপুল দাড়ি কোমর পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েচে। রমাইএর মাকে দেখে বল্লে, "মা, এসেছ?" বলে মাটিতে মাথা নীচু করে ভক্তি-ভরে সেলাম কর্‌লে।

রমাইএর মা চীৎকার করে কেঁদে উঠে বল্লে, "রহিম, রমাইকে গঙ্গার জলে রেখে এসেছি!"

রহিম হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে এসেছিল—প্রথমটা কিছু বুঝ্‌তে না পেরে যেন হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা পাঙাসে হয়ে গেল! সে বল্লে, "সে কি? কি হয়েছিল তেনার?"

রমাইএর মা কথার কোন উত্তর না দিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদ্‌তে লাগল।

বল্লাম—"তার ওলাউঠা হয়েছিল।"

রহিম হায়, হায় করে' কপালে হাত দিয়ে মাটির উপর বসে পড়ল। বুড়োর শুক্‌নো দু'টি চোখ থেকে জল টস্‌টস্ করে বেরিয়ে দাড়ি বয়ে মাটিতে ফোঁটা-ফোঁটা পড়তে লাগ্‌ল।

সে বল্লে, "আল্লার মর্জ্জি বোঝা শক্ত বাবু, এই মেয়ে লোকটার কি না হলো—সাত ছাওয়ালের একটাও রইল না!"

রমাইএর মা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, "আমার ত কাঁদলে চলবে না রহিম! এই বাছাদের কিছু খাওয়া হয়নি—কি উপায় হবে?"

রহিম মাথা চুল্‌কে বল্লে, "তাই ত মা! ভুনির দোকান ত খোলা নেই; রাতও ভারি হয়ে গেছে। এখন ত কিছু তাকে তোলাও যাবে না!"

অমিয়া আমার মুখের দিকে বিদ্যুতের মত কটাক্ষ কর্‌লে। তার অর্থ আমার বুঝ্‌তে একটুও বাকী রইল না। আমি একটু হেসে তার জবাব দিলাম।

রহিম বল্লে—"দেখি, ঘরে কি আছে মা—একটু সবুর কর।"

আমরা ঘরের দাওয়ার উপর বসে রইলাম। সামনে ডিবেটা জ্বলচে। আলোটা আল্‌কাতরা-মাখানো দোরের উপর পড়েচে। কড়াতে মস্ত বড় পেতলের তালা ঝুলচে। কালো দোরের উপর উইএর মাটির ঘর শাখা-প্রশাখায় একদিক্ থেকে অপর দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত!

রমাইএর মার মনটা এই দুশ্চিন্তায় এমন ভরে ছিল যে, দরজাটা খোলার কথা মনেই হয় নি।

আমরা খানিক চুপ করে বসে থাকার পর—চমকে উঠে বল্লে—"বাছা রে আমার, তোমরা ধুলোয় লুটোচ্চ—আর আমি মাগী দোরটা পর্য্যন্ত খুলে দি'নি!"

ছোট্ট ঘরখানি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মেজেটি মাটি দিয়ে নিকোন; তক্‌তক্ করচে—সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত পড়লে তুলে নেওয়া যায়। ঘরের একদিকে একটা বড় চৌকি—আর অন্য দিকে একখানি একজুনে খাট!

রমাইএর মা খাটটি তাড়াতাড়ি ঝেড়ে দিয়ে বল্লে, "বাবা, তুমি বসে জিরোও।"

আমি খাটটি অধিকার করে বসে, ক্রমে তাতেই গড়িয়ে গেলাম।

অমিয়া বাড়ী দেখ্‌তে বার হয়ে গেল। হঠাৎ তার এ বিষয়ে আগ্রহাতিশয্য হলো।

চৌকাঠের কাছে ডিবেটি জ্বলছে—তারি আলো ঘরের মটকা অবধি গেছে। করোগেট টিনের ছাদ, মাটির দেয়াল। দেয়ালে একটি ময়ূর আঁকা—মনে হলো ছোট ছেলের চিত্রিত—হয় ত রমাই নিজে তার চিত্র-বিদ্যার পরিচয় রেখে গেছে।

হঠাৎ এই ছেলেটির জন্য আমার মনটা খাঁ-খাঁ করে উঠ্‌ল। সব —সেই কেবল নেই! ইঁট-পাথরের চেয়ে আমরা নিজেকে কং মনে করি!—যুগ-যুগান্তর ধরে সেই ইঁট, সেই পাথর, সেই মাটি থেকে যায়; কিন্তু মানুষ দলে-দলে পালে-পালে কোথায় নিমেষ মিলিয়ে যাচ্ছে!

অমিয়া ফিরে এল; রমাইএর মা রহিমের বাড়ী গেছে। সে ওদিক্ করে আমার খাটের পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্‌লে, "এখ না এলেই হতো।"

"কেন।"

"উঃ বাবা, কি বুনো দেশ—এ দেশে কেমন করে মানুষ থা —চল, কালই আমরা চলে যাই।"

পদ্ম-পাতায় শিশির-বিন্দুর মত তার মনটি চির-অস্থির। সে জানে না, কি চায়! যা চায়—তা পাবার আগেই তাতে অ পড়ে। এই তার প্রকৃতি—একটা অসম্ভব-অদ্ভুত!

আমি হেসে বল্লাম, "আমার কিন্তু বেশ লাগ্‌ছে—শুয়ে-শুয়ে ঐ ময়ূরটি দেখ্‌চি। কাঁচা হাতের ছবি; কিন্তু চিত্রকর সহিষ্ণু—তোমার মত অধীর নয়।"

অমিয়া বল্লে, "বেশ, আমি অধীর—তুমি ত সুধীর—বাঁচ্‌লুম। নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে—তোমার আর জোড়া নেই।"

"আমি ত বলিনি যে আমি সুধীর—তুমি এমন করে মিথ্যে বলো না কিন্তু—"

"বেশ্ বেশ্—আমি মিথ্যে বলি—সে আমার ইচ্ছে—আমার ত' আর জ ষ্ঠিরগিরি করতে হবে না। আমাদের এই মিথ্যের সংসারে—মিথ্যেরই পার করতে হবে।"

ঝলাম, অমিয়া আমার সঙ্গে মিছে ঝগড়া করে আমাকে জাগিয়ে আলে চায়। ঘুমিয়ে পড়লে উঠে খাবার পাত্র আমি নই।

মস্ত ‍াম, "নাঃ, এ মিছে তর্কে রাত কাটাতে চাইনে; একটু মাটির নিলে কাজ হতো।" পাশ ফিরে শুতেই অমিয়া বল্লে—"সত্যি বিস্তৃত শোন।"

রমন না নড়ে-চড়ে চুপ্ করে পড়ে রইলাম।

খোলার য়া বল্লে "একমনে বুঝি ভগবান্‌কে ডাক্‌চ?"

"বাছা নি ত আজ দয়া করবেন বলে মনে হয় না।"

পর্য্যন্ত তে কিছু যায় আসে না।"

ছোট্‌ন পরীক্ষায় তিনি আজ পড়েছেন—ভক্তটির জন্যে এত তক্‌তক্‌ার চোখে ঘুম নেই—নিশ্চয় ভাবচেন কি জোগাই, কোত্থেকে একদিকে

আমি জবাব দিলুম না।

"বিশ্বাস কি কম হয়ে এল? কথা কইচ না?"

"অবিশ্বাসীর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তাঁর দয়ার নিগূঢ় তত্ত্বের কথা মানুষ মানুষকে বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারে না। এ সব কেবল অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়।"

অমিয়া বল্লে "সে কথা সত্যি—তাই ত আমি ভেবে পাইনে।

"কি?"

"আমাদের অন্তরটাই ত বড় শুনেচি—তোমাদের মাথাটা; কিন্তু এ যে উল্টো হয়ে গেল—তুমি তাঁকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চাচ্চ—আমি খুঁজচি বুদ্ধি দিয়ে।"

"তাই তুমি তাঁকে পাচ্চ না।"

"তুমি কি পেয়েছ?"

"পাইনি বটে; কিন্তু পাবো আশা রাখি—এই যে না পাওয়া—তাই এত স্নিগ্ধ, এত মধুর।"

"সম্প্রতি কি খুব মধুর মনে হচ্চে?"

"হচ্চে বৈ কি?—সবাই কি সব জিনিস পায়! কিন্তু পাবার বাসনা-টাকে যে তীব্র করে জ্বালায়—সে মরে জ্বলে; আর যে তাকে ধূপের মত নিভিয়ে গুমরে জ্বালায়, তার সমস্ত দেহ-মন তাঁরি গন্ধে—তাঁরি রসে সরস হয়ে উঠে।"

"কিন্তু ধূপ ত নিজে পুড়ে খাক্ হয়।"

"হোক না—তাতে কার কি ক্ষতি?"

বাইরে পায়ের শব্দ শুনা গেল। রমাইএর মা এসে বল্লে, "বাবা, উঠে এস, আর রাত করো না।—যা-হয় একটু জোগাড় হয়েচে।"

উঠে গিয়ে দেখি, রহিম সেই রাত্রে তার গাই হুয়ে দুধ সংগ্রহ করেচে—একথাল খাসা ধানের চিঁড়ে—একছড়া মর্ত্তমান কলা—তার পাশে এক বাটি গুড় !

তা দেখে সন্ন্যাসীর বৈরাগী-হৃদয় নৃত্য করে উঠ্‌ল।

আমি অমিয়ার মুখ পানে চাইতেই সে হেসে বল্লে, "আমার আর এক তিল অবিশ্বাস নেই ; কিন্তু মেয়ে, এ রাত্রে তুমি কি কাণ্ড করেচ। তাই এই দেরি !"

রহিম বল্লে, "না মা, এসব আমার ঘরে ছিল—দুধটা দুইতে একটু দেরী হয়েচে—নেহায়েৎ অসময় কি না ?"

রহিম চাচাকে মনে-মনে শত ধন্যবাদ দিয়ে—প্রচুর ফলার শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

যে খায় চিনি, তার চিনি জোগান চিন্তামণি !

১৬

রমাইএর মা বাড়ী-ঘর বিক্রী করে কাশীবাস করাই স্থির করলে। তার ব্যবস্থা করবার জন্যে ডাক পড়ল বড় জামাইয়ের। তিন মেয়ের মধ্যে একজনের মাত্র বিবাহ হয়েছিল—একটি ছেলেও হয়েছিল তার! কিন্তু অসময়ের ডাকে চলে যেতে হলো তাকে। জামাইটি আর বিয়ে করেনি। সংসারে বিধবা বোন ছিল—সেই ছেলেটিকে মানুষ করচে। জামাই আর কিছুতেই বিয়ে করলে না। রমাইএর মা নিজে গিয়ে কত উপরোধ অনুরোধ করাতেও কথা থাকেনি! শুন্‌লাম—সে লোক খাঁটি; নিজে যা বোঝে তাই করে—কারুর কথার কি মতের কোন তোয়াক্কা রাখে না। রহিম গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌বে স্থির হলো।

গ্রামখানি ছোট—সকালের মধ্যেই যা-কিছু দেখ্‌বার-শুন্‌বার ছিল, শেষ করে এসে ঘরের মধ্যে বস্‌লাম। অমিয়া এক থাল মুড়ি আর নারকেল নিয়ে এসে বল্লে, "এই জলখাবার খাও।"

আমি বসে-বসে ধীরে-সুস্থে মুড়ি চিবোতে লাগ্‌লাম। অমিয়া মেজের উপর চুপটি করে বসে রইল।

আমি বল্লাম, "তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

"তাই হয়েছি নাকি?—আমি নিজে ত কিছুই বুঝিনে।"

"তোমার ডাঙ্গার হাওয়া ভাল লাগ্‌চে না বোধ হয়।"

অমিয়া খানিক চুপ করে থেকে বল্লে, "কি জানি কেন, আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। মনটা যে কি অস্থির হয়েচে—কি তোমাকে বল্‌ব।"

এ কথার কি উত্তর থাকৃতে পারে ? চুপ্ কল্লে, একমনে মুড়ি চিবিয়ে চল্‌লাম।

অমিয়া বল্লে, "আজই চল চলে যাই—না হয় দিনকতক পরে এসে মেয়েকে নিয়ে যাব।"

"আমার কোন আপত্তি নেই—তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিলে আমি যে মুক্তি পাব—তার আশায় আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করচে।"

অমিয়া বিষণ্ণ-মুখ নীচু করে—নখ দিয়ে মাটির উপর কি লিখ্‌তে লাগল। লেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি পুঁছে ফেলে বল্লে, "তোমায় আমি অত শীঘ্র ছেড়ে দিতে পারবো না, বোধ হয়।"

বল্লাম, "সে কি কথা—আমি আর থাকৃতে পারব না।"

"যদি দেখ, আমার কেউ নেই—তা হলেও ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ?"

অমিয়ার এই কথাটা বল্‌তে কতখানি বুকে ব্যথা লেগেছিল,—তা তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

বল্লাম, "তোমার বাড়ী-ঘর বিষয়-আশয় আছে—তোমার ভাবনা কি অমিয়া—ভাস্‌বে কেন ?"

"যদি বাবা না থাকেন ?"

"বাপ ত কারুর চিরদিন থাকে না অমিয়া—" আর বল্‌তে পারলাম না—গলা যেন ভেরে এল।

"তাঁকে ফিরে পাবার আশা আমি এক তিলের জন্যেও রাখিনে ; কিন্তু তিনি না থাক্‌লে আমার আর কে আছে ?"

একটা কথা আমার মনের মধ্যে জোর করে উঠ্‌লৗ—সেটাকে চাপ্‌তে গিয়ে নিমেষে আমার মুখ-চোক নাক কাণ লাল হয়ে উঠ্‌ল। গোপন করবার চেষ্টা করলেও দিনের আলোতে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

অমিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "কি বল্‌তে গিয়ে চেপে নিলে, তা আমি বুঝতে পেরেচি। বল্‌ব ?"

আমি অপ্রতিভ হয়ে রইলাম।

"তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলচ; কিন্তু সে ত আমার হয়ে গেছে।"

আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লাম, "এর মধ্যে কবে হলো ? তুমি ত বলেছ তোমার বিয়ে হয়নি।"

"তারপর একদিন, হয়ে গেছে—তা' তো তুমি জান। যেদিন আংটি তোমার হাতে দিয়েছি, সেইদিন যে তোমাকে বরণ করেচি।"

আমি শুক্‌নো গলায় বল্লাম—"কি সব পাগ্‌লামির কথা এ,—আংটি-টাংটি আমি জানিনে। ব্রহ্মচারীর আবার আংটি কি—বরণ কি ? সত্যি বলচি তোমায়—ওসব কাজের কথা নয়।"

অমিয়া স্নিগ্ধ হেসে বল্লে—"তা হলে প্রত্যাখ্যান ? বেশ, ফিরিয়ে দাও আমার সেই ভালবাসার জিনিসটি !"

আমি বল্লাম, "এখুনি পারব না—আচ্ছা নিশ্চয় কিন্তু—সে যেমন করেই পারি, ফিরিয়ে দেবই।"

"আমার এক্ষুণি চাই—নইলে আমি ফেরৎ চাইনে।"

"যা অসম্ভব—তাই তোমার চাই—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় জুটিয়েছ ভগবান্, আমাকে !"

"পাগল বল, আর যাই বল—আমি কিছুতেই শুন্‌চিনে তোমার কথা;—আমার আংটি দিয়ে দাও আমাকে; যদি না দিতে পার ত' আমাকে স্বীকার কর।"

হাস্য-পরিহাসের নীচে সত্য অনেক সময়ে ঠিক এম্‌নি করেই প্রচ্ছন্ন

নিহিত থাকে। তার অস্তিত্ব মনটা কেমন গম্ভীরতম নিগূঢ় অনুভূতি দিয়েই জানতে পারে।

অমিয়ার মনের খাঁটি সুরটি আমার প্রাণে যে ঝঙ্কার বাজিয়ে তুল্‌ছিল—তাকে হাসির উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে চেপে রাখা শক্ত দাঁড়াচ্ছিল।

মেয়েদের মনটা ঠিক যেন লাউ-ডগার মত; শুক্‌নো কঞ্চি কাঠিতেও সে ভর করতে চায়;—কোন বিবেচনা নেই যে, কঞ্চি তার ভার নিতে পারে কি না!

মানুষের মন ত অনুক্ষণ ভালই বাস্‌চে—সেই তার প্রকৃতি। গরীব তার কুঁড়ে ঘরটিকেও প্রাণের চেয়ে ভালবাসে,—খেলার পুতুলটি হারিয়ে গেলে শিশু চখে অন্ধকার দেখে। ছোট-বড় কোন জিনিসের উপর মানুষের হৃদয়ের আসক্তি কোথাও ত কম দেখি না।

একে মায়া বল, আসক্তি বল, টান বল, কি আকর্ষণ বল—তাতে কারুর কোন আপত্তি নিশ্চয়ই হতে পারে না। এই ভাবটা জন্মায় ঘনিষ্ঠতা থেকে। এর ভিতর দিয়ে ভালবাসা অঙ্কুরিত হতে পারে; কিন্তু সব সময়েই যে হবে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম যে অমিয়ার মনে এমনি একটা—কিছু জেগে উঠ্‌ছিল।

অমিয়া অনেক সময়ে এসব কথা খুব সোজা ভাবে আমার সঙ্গে কয়ে থাকে; কিন্তু আমি কোনদিন তেমন করে জবাব দিতে পারিনি। আজ হঠাৎ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি ঘাড়ে চাপ্‌ল; বল্লাম, "একটা কথা জান্‌তে চাই—তার ঠিক উত্তর দেবে?"

"যদি জানি ত বল্‌ব।"

"যতদূর বুঝ্‌চি, তুমি আমাকে চাও। আচ্ছা, একটা কথা কি

তোমার একদিনও মনে হয় না! আমি কি তোমাকে চাই? এটা কি একবার ভেবে দেখ্‌বার বিষয় নয়?"

"তাই ত—আমি তেমন করে কোন দিনই ত ভাবিনি! আমার মনে হয়, যাকে আমি এমন করে চাই, সে কি আমাকে না চেয়ে থাকৃতে পারে?"

আমি হেসে বল্লাম, "তা' যে হতেই হবে, তার কি মানে? দেবযানী কচকে চেয়েছিল, কিন্তু কচ কি দিয়েছিল তার প্রতিদানে?"

অমিয়া বল্লে, "কচ কিন্তু দেবযানীকে ভাল বেসেছিল।"

"তা হতে পারে; কিন্তু কচ নিজের জীবনের কর্ত্তব্যকেই বড় বলে মেনে নিয়েছিল। এই খেনেই যে তার দেবত্ব অমিয়া!"

"আমি যে মানুষ—কোন দিনই দেবত্বের দাবী করতে যাইনি।"

"মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য আছে—তার দাবী যে সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মানুষের আদর্শ আছে,—তাকে খর্ব্ব করলে আত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।"

"তা হলে যাকে ভালবাসি, তাকে পেতেও না পারি?"

"তা ত বটেই, সব সময়ে তাকে যে পেতেই হবে—তার কি অর্থ? আর না পাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই, বরং পরম লাভ। আদর্শটি অক্ষুণ্ণই থেকে যায়।"

"এ কথা শুন্‌লে আমার ভয় করে। অমন যার হয়—আহা! কত বড় দুঃখের সাগরই না জানি, তার বুকের মধ্যে!"

"দেবযানীর কি তাই হয়েছিল?"

"হয়েছিল বই কি, তার মত অসুখী কে ছিল?"

"প্রবৃত্তি যেখানে বেড়ে, আর সবের চেয়ে বড় হয়ে উঠে—সেখানে

এই কাণ্ডই ঘটে। এই প্রবৃত্তি-গুলোর মুখে লাগাম দিয়ে তাদের সুপথে নিয়ে যাবার শক্তিই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই চেষ্টাই মানুষের জীবনের প্রধানতম চেষ্টা। আত্ম-সংযম ত এই অমিয়া! প্রবৃত্তির নিরোধ যার নেই—তার কি আছে?"

"তোমার এই ধর্ম্ম-কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। তোমরা এই সবই বুঝি মঠে শেখ?"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম।

অমিয়া চুপ করে বসে রইল। আমি আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

একটা প্রকাণ্ড ভার আজ নেমে চলে গেল মনের উপর থেকে! এমন করে কোন দিন যে অমিয়াকে বল্‌তে পার্‌ব—তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। বাঁশ-ঝাড়ের তলায় উঁচু টিপির উপর চুপ করে বসে-বসে ভাবতে লাগ্‌লাম। মনে হলো হৃদয়ের সমস্ত তারগুলো এক নিমেষে কে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। চখের জল কিছুতেই বাধা মান্‌তে চায় না; যেন তার আর শেষ নেই!

১৭

একটা লাঠির ডগায় পুঁটলি বেঁধে রহিম চাচা দেখ্‌লাম, হন্‌-হন্‌ করে কোথায় চলেছে। আমাকে দেখে একটু থম্‌কে দাঁড়াল। আমি আস্তে-আস্তে তার কাছে এগিয়ে এসে ধর্‌লাম—"কোথায় চল্লে, লাঠি-সোঁটা পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে, চাচা ?"

"একটু দূরের পথে বাবু,—যাচ্ছি দবিরপুরে—মার বড় জামাইকে নিয়ে আস্‌তে।"

দবিরপুর ত শোনা নাম। বল্লাম, "কি করেন তিনি ?"

"সোণা-রূপোর কাজ।"

"নামটা কি বিষ্ণুদাস ?"

"হাঁ বাবু, আপনি চেনেন ?"

"চিনি বৈকি, চাচা—তুমি এক মিনিট দাঁড়াবে ? আমি একটা চিঠি লিখে দিতাম !"

রহিম সূর্য্যের দিকে চেয়ে বল্লে,—"তা সময় হবে—আমি ভুনির দোকানে আছি—আপনি নিয়ে আসুন।"

বাড়ী ফিরে গিয়ে বিষ্ণুদাসকে একখানা চিঠি লিখে দিলাম। আস্‌বার সময় আংটিটা সঙ্গে করে আন্‌তে, আর তার কথা যেন কেউ না জান্‌তে পারে।

ভুনির দোকানে গিয়ে দেখি, রহিম এক হাঁড়ি সন্দেশ নিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

চিঠিটা দিয়ে বল্লাম, "কবে তুমি ফিরবে রহিম ?"

"কাল সন্ধ্যে নাগাদ, বাবু।"

"বেশ।"

রহিম দক্ষিণের পথ ধরে চলে গেল। আমি বাড়ীমুখো হ'লাম।

মাকড়সা যেমন জাল বুনে তারি ভিতর বিচরণ করতে থাকে; তার বাইরের খবর জানেও না, জানতে চায়ও না; সেই তার সব, সেই তার বিশ্ব-সংসার! আমার অবস্থা যেন ঠিক তেমনি হ'য়ে পড়ছিল। নিজের বোনা জালের মধ্যে আমি এমনি ক'রে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিলাম যে, সময়ে সময়ে আমার মুক্তি নেই বলে ভয় করত; কিন্তু এই জালটি এত প্রিয় হ'য়ে পড়েছিল যে, তা ছেড়ে বাইরে গেলেও মন হাঁক-পাঁক ক'রে উঠত।

মনে হ'ল অমিয়াকে যে রূঢ় আঘাত দিয়েছি, তা থেকে না জানি কতই বিষাদ রস ক্ষরিত হ'চ্চে। তাতে প্রলেপ দেবার ইচ্ছে হ'লো। মনে হলো তাকে ডেকে দেখিয়ে দিই যে, কতখানি ব্যথায় আমারও সমস্ত চিত্ত আহত হ'য়ে রয়েছে!

এটা ঠিক, যে তার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা পড়তেই পারে না। কেন পারে না?

যে ফুল দেবতার পূজায় একবার নিবেদিত হয়েছে, তাকে যে মানুষ আর কোন কাজেই লাগাতে পারে না। যার জ্ঞান হয়েছে, সে নির্ম্মাল্যকে মাথায় রাখতে পারে—কেমন করে পা দিয়ে দলবে। আমি কেমন করে আমার এই চিত্ত-কমলটি অমিয়ার হাতের লীলা-কমল হতে দেব।

তা হতেই পারে না—তা হতেই পারে না!

সত্যিই কি তাই? মনটা আবার ফিরে দাঁড়াল। কে তোমার

দেবতা,—কার পায়ে, কবে তুমি আমাকে নিবেদন করে দিয়েছ ব্রহ্মচারি ?

সে কোন্ দেবতা ! যিনি আমার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী। মনের অন্ধি-সন্ধি খুঁজে ফির্‌লাম। কোথায় তিনি—কোথায় তিনি !

তখন মনকে ডেকে বল্লাম—মন তুই সত্যি করে বলে দে—তুই কার হতে চাস্ ?

বধূটি যেমন অবগুণ্ঠনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে—নবীন পতির লক্ষ প্রশ্নের জবাব দেয় না—মনটি আমার তেমনি করে অবগুণ্ঠনের আড়ালে মৌনী হয়ে রইল—সে কিছুতেই কথা বল্‌বে না।

তুমি কথা না কইলেও তোমার—যে ইঙ্গিত আছে—তার ভাষা আমার কাছে ত অবিদিত নেই ! তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে তুমি ঘোমটা টেনে লম্বা করে দাও—আবার দূরে সরে গেলে যে জান্‌লার ফাঁকে তোমারি কালো চোক দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠে !

এ লুকো-চুরির দরকার কি ? খুলে দাও তোমার হৃদয়ের কপাট ; তাতে সত্যের প্রদীপ্ত আলো প্রচুর এসে পড়ুক !

তা সইবে না—সইবে না। এই লুকো-চুরিই তার ব্যবসা—সমস্ত জীবনের অভ্যাস যে !

আবার এসে সেই উঁচু ঢিবিটার উপর বস্‌লাম। মাথার উপর বাঁশ-ঝাড় নুয়ে পড়েছে ; তাতে দু'টো ঘুঘু বসে করুণ আওয়াজ কর্‌চে। বসে-বসে তন্ময় হয়ে তাই শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

অদূরে রমাইদের বাড়ী। টিনের ছাদের উপর একটা বুড়ো কদমগাছ ঝুঁকে পড়েছে। তাতে একগাছ ফুল হয়ে রয়েছে। কদম-গাছের একটা ডাল জান্‌লার উপর হেলে পড়ে সেখানটা অন্ধকার করে দিয়েছে।

হঠাৎ জান্‌লার ভিতর অমিয়ার কালো দু'টি চোখ দেখ্‌তে পেলাম,—তার ভিতর যেন বিশ্বের নিখিল ব্যথা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

মনটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। একবার মনে হলো বনের হরিণের মত ক্ষিপ্র-চরণে সেই কালো দু'টি চোখের ছায়া থেকে দূরে—বহুদূরে পালিয়ে যাই। কিন্তু কেন? ওতে ত আগুন নেই, দাহও নেই; ও যে সাগরের মত স্বচ্ছ-শীতল! নির্ম্মল-নীল, প্রশান্ত-সুন্দর! ওর আহ্বান যে মর্ম্মের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আকুল করে তোলে!

দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই অমিয়া গরাদের মধ্যে দিয়ে তার সুগোল হাতখানি বার করে হাত-ছানি দিয়ে ডাকৃলে।

একপা-একপা করে বাড়ীর ভিতর চলেছি;—রমাইএর মা বার হয়ে এসে বল্লে, "এই যে বাবা, বেলা করো না—চল খাবে চল।"

শিউলি ফুলের পাপ্‌ড়ির মত শুভ্র-সুন্দর ভাতের স্তূপ, তার পাশে থরে-থরে পঞ্চ-ব্যঞ্জন! পাশে বসে গেলাম।

এরি জন্যে পুরুষ নারীর কাছে আবদ্ধ! অন্তরের স্নিগ্ধ স্নেহরসের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা সেই ব্যঞ্জনগুলিতে! তাতে তিক্ত আছে, কটু আছে, অম্ল আছে, মধুর আছে! অন্য দেশের কথা জানিনে—আমাদের দেশের এই যে হৃদয়-বিতরণ, এই যে পুরুষের তৃপ্তি'র জন্য নারীর একান্ত চেষ্টা, একে সুখ্যাতি না করে কোন্ পাষণ্ড থাকৃতে পারে?

অমিয়ার চোখের মধ্যে প্রশ্নটি স্বচ্ছ হয়ে ফুটে রয়েছে দেখ্‌লাম—কেমন হয়েচে? এতে কি তোমার তৃপ্তি হবে?

আমি বল্লাম, "আজ মাকে মনে পড়চে; এমন আদর কেবল তাঁর কাছেই পেয়েছি একদিন!"

"আর কার কাছে পাবে তেমন, কপাল যে পুড়িয়ে বসে আছ।"

"কিন্তু পোড়া-কপালের জোর আছে, দেখ্‌ছি।"

কিছুক্ষণ আর কথা কইবার ফুরসৎ হলো না। আমি খেতে লাগ্‌লাম। অমিয়া নিবিষ্ট-মনে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

বল্লাম, "এমন আদর স্ত্রীর কাছে পাওয়া যায় বলে ত' মনে হয় না।"

"কেন? কেমন ক'রে জান্‌লে তুমি?"

"বলা শক্ত। মন অনেক জিনিস অজ্ঞাতসারেই জেনে বসে থাকে। কৈফিয়ৎ তলব কর্‌লে—তার একটা মুস্কিল হয়—এই পর্য্যন্ত, তার উত্তর হয় ত কিছু থাকেই না।"

অমিয়া বল্লে, "মা যে উপকরণে গড়া স্ত্রী কি তা দিয়ে নয়?"

"একই বটে; কিন্তু অবস্থার প্রভেদ। মা ছেলের কাছে কিছু দাবী না রেখে সর্ব্বস্ব দিয়ে দেন, আর স্ত্রীর দাবী আছে—দানের প্রতিদান আছে, তার হিসেব-নিকেশ আছে।"

"কোন স্ত্রী নিক্তির তৌল করে না।"

"তা যদি কর্‌তো তা হলে ত বিষয়টা মোটেই জটিল হতো না। দোকানীর লেন-দেনের মত সে ঠিক তেমনি হতো—ফেল কড়ি মাখ তেল।"

"তাই যদি হয় ত' তোমাদের আপত্তি কি?"

একটু হেসে বল্লাম, "আপত্তি করায় লাভ? তাতে অশান্তি বই শান্তি নেই, নিশ্চয়।"

"একেবারে নিশ্চয়?"

"নয় ত কি?"

"জানিনে, অনধিকার-চর্চ্চা করা আমার অভ্যাস নাই।" ব'লে সে ফিক্‌-ফিক্‌ করে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"তোমরা ভোগ জিনিষটার উপর এতটা খড়্গহস্ত যে কেন, বুঝেই উঠ্‌তে পারিনে। নিজেরা যে ভোগের প্রার্থী—এ কথা বুঝি তোমাদের মনে হয় না? মার স্নেহ মিষ্টি, কেন না সেখানে ভোগের কথাই আসে, ত্যাগের কথা নেই বলে। কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসার প্রতিদান দিতে হবে ব'লে এমন আড়ষ্ট হবার কি দরকার? দেওয়া-নেওয়া ত সমানে-সমানে। তাতে অক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতারই ত পরিচয় বেশী। তোমরা এমন করে নিজেদের ছোট করে দাও কেন? এই কি তোমাদের পৌরুষ?

"ত্যাগটা যে বড় মধুর অমিয়া!"

"যা ত্যাগ করবে—তা' ভোগ করবার যদি লোক না থাকে? ত্যাগের কি একটাই দিক্? নদীর সমস্ত জীবনটাই ত্যাগ, কিন্তু পরিণতিতে যে পরম সম্ভোগ।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলাম। মনে কর্‌লাম যে এই মেয়েটিকে শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা সফল হয়েচে। এমন করে তলিয়ে দেখ্‌তে পারে ক'জন?

বল্লাম,—"তা যাই বল—ভোগ মানুষকে মোটা ক'রে স্থবির ক'রে দেয়; তাতে তামসিকতা আনে, সাত্ত্বিকতা নেই।"

"এ কি গীতা?"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম। গীতাকে সে প্রায়ই ঠাট্টা কর্‌ত। গীতার কথা তুল্লেই সে বল্‌ত, "দায় পড়েছে ভগবানের ঐ সব বল্‌বার। দু' চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে মানুষের ভড়ং আর ভণ্ডামির ছল। যা নিজে বুঝেছ তাই বল; পরের মুখের ঝাল খাবার দরকার কি?"

বল্লাম, "ও আমার আত্ম-গীতা।"

"তা' হলে শুন্‌তে পারি; কিন্তু প্রেরণা নয় ত?"

বল্লাম, "তাতে দোষ কি ?"

"তা'হলে শোনবার অযোগ্য !"

"তবে আর বলে কি হবে ?"

"কোন লাভ নেই—ও আমি শুনতেও চাইনে।"

সে একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "পেটের ক্ষিদে চেপে রেখে যে নিজেকে নিখাকি বলে প্রমাণ করতে চায়, সে—"

"প্রকাণ্ড মূর্খ।"

"উহুঁ—নিরেট বোকা। ক্ষিদেটা যে একটা শরীরের ধর্ম্ম, এ স্বীকার করতে কিসের লজ্জা, তা'ত বুঝেই উঠ্‌তে পারিনে। ক্ষিদে মিটে গেলেও যে খাই-খাই করে—তার অবশ্য নিন্দে আছে। যদি সংযম বলে কিছু থাকে ত' সেই খেনে। যে জীবনে খেলে না—তার কাছে উপোষের কোন দাম নেই। গরীবের আবার ত্যাগ কি ? ত্যাগ যদি করতে হয় ত বুদ্ধের মত কর। সোণার সংসার, স্ত্রী-পুত্র সব রেখে যে ত্যাগ—তাই আসল্ ত্যাগ।"

আমার মনটা দোলার মত দুল্‌তে লাগ্‌ল—এদিক্-ওদিক্ ! ভোগের মধ্যে ত্যাগ ! বিরহের মধ্যে মিলন ! শক্ত কথা ! সকলে কি পারে ?

বুদ্ধদেবের কথা মনে হলো। এতখানি ভোগের মধ্যে কেমন ক'রে সর্ব্বত্যাগ মাথা তুল্‌তে পেরেছিল। ভগবান্ সহায় না হলে মানুষের কিছু হয় না। কিন্তু মানুষের কি মানুষ সহায় নয় ? বুদ্ধি কি তার কিছুই নয় ? কি জানি কে বলে দেবে আমাকে ?

দেখ্‌লাম অমিয়ার মুখখানা দিব্য-জ্যোতিঃ-মণ্ডিত ; যেন সংসারের সমস্ত লীলা শেষ করে সে বিরাগের সিংহাসনে বসে মানুষকে নির্দ্দেশ করে দেবে পথ কোন্ দিকে ! আমার সমস্ত অহঙ্কার নিমেষে তার চরণের তলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়বার জন্য ধাবিত হলো !

বিষ্ণুদাসের অপেক্ষায় দিনটা পথে-পথেই কেটে গেল। মিনিট-গুলো যেন ঘণ্টা, আর ঘণ্টাগুলোকে দিনের মত দীর্ঘ বলে মনে হতে লাগ্‌ল।

দিন শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার বাঁশ-বনের মাথার উপর ঘনিয়ে এলো, তবুও তাদের দেখা নেই। একবার মনে হলো, ছুটে এগিয়ে যাই,—রাস্তা চেনা থাক্‌লে হয় ত তাই ঘট্‌ত।

গোঠ থেকে গরুগুলো বিপুল ধূলো উড়িয়ে ফিরে এল; ঘরে-ঘরে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল! অনেক দূরে যেন মনে হলো একজন কে আস্‌চে। একজন দেখে সন্দেহ হলো; এগিয়ে আস্‌তে চিন্তে পার্‌লাম যে বিষ্ণু-দাসই বটে।

বিষ্ণুদাস আমাকে গড় করে প্রণাম করে বল্লে, "আমার আসা সম্ভব হতো না,—কেবল ঠাকুর, তোমার দেখা পাব বলেই এলাম; আমার ছেলে—নিধুর জ্বর দেখে এসেছি।"

বল্লাম, "রহিম কোথায়?"

"সে আস্‌চে পিছুতে—গাড়ীতে বড় দেরী হয়—রোদ পড়ে যাওয়ার পরই হেঁটে আস্‌চি।"

আংটিটা সে আস্তে-আস্তে বার করে দিয়ে বল্লে, "আমি সেদিন বুঝ্‌তেই পারিনি যে ঠাকুর, তুমি রমাইকে বাঁচাবার জন্যে এটা আমার কাছে রেখে এসেছিলে। তোমার চিঠি আর রহিমের কথা থেকে সব বুঝ্‌তে পার্‌লুম।"

আংটিটা নিয়ে বল্লাম, "কিন্তু টাকা এখন ত' দিতে পার্‌ব না—আমি মঠে ফিরে তার জোগাড় করে পাঠিয়ে দেব।"

"কি ছাই-পাঁশ টাকার কথা বল্‌চ ঠাকুর,—টাকা আবার কি দেবে, ও ত' আমাদের কাজেই লেগেছে; টাকা দিয়ে আর অপরাধ বাড়িও না।"

আমি মনে-মনে ভাব্‌লাম যে টাকার প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নেই—সে পরে পাঠিয়ে দিলেই চল্‌বে।

পথে চল্‌তে-চল্‌তে বল্লাম; "কিন্তু এর কথা যেন কেউ না জান্‌তে পারে। জান্‌লে গোল হতে পারে।"

বিষ্ণুদাস বল্লে, "সেই জন্যেই ত এগিয়ে আসা—সঙ্গে রহিম পর্য্যন্ত নেই। নাঃ; এ কথা তোল্‌বার কি দরকার হবে জানিনে।"

আংটিটা গোপন করে নিলাম।

পথে অনেক কথা হলো। বিষ্ণুদাসের কাল সকালেই ফিরে যেতে হবে। রমাইএর মাকে সে দবিরপুরে নিয়ে যাবে। তারপর নিধু ভাল হলে—ফিরে এসে যা-কিছু ব্যবস্থা হবে।

অতএব কাল সকালে আমরাও রওনা হব। মন আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌ল। মনে হল এই রাতের ব্যবধানটা হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দি।

বাড়ী ফিরে কিছুক্ষণ রমাইএর মার বিলাপ শুন্‌তে হলো। তারপর আমাদের প্রশংসার পালা। সেগুলো নিস্তব্ধে হজম করা ভিন্ন আর উপায় কি?

বিষ্ণুদাস শেষ পরে বল্লে, "মা, আমাকে কিন্তু কালই ফির্‌তে হচ্চে—নিধুর জ্বর দেখে এসেছি—তোমাকেও যেতে হবে।"

দৌহিত্রের অসুখ শুনে রমাইএর মা চম্‌কে উঠ্‌ল—"কি সর্ব্বনাশ—

তবে তোমার আস্‌বার কি দরকার ছিল বাবা!—হে মা দুর্গা, হে মা কালী, আমার ঐ খুঁদ-কুঁড়োটুকু বাঁচিয়ে রাখ মা!" ইত্যাদি ইত্যাদি—

তর্ক-বিতর্কে অনেক রাত হলো;—শেষ স্থির হলো যে তার পর দিন খাওয়া-দাওয়া করে আমরা রওনা হব।

ঘরে ফিরে দেখ্‌লাম অমিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের মিট্‌মিটে আলোতে তাকে বিছানার উপর একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত দেখাচ্ছিল। একখানা হাত চৌকির বাইরে ঝুলে পড়েচে,—আস্তে আস্তে সেটা তুলে দিলাম। গভীর ঘুম, সে জান্‌তেও পারলে না।

আমি নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে রমাইএর আঁকা ময়ূরটি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। ঘাড়টা উঁচু করে তার পেখমটা সমস্ত দেয়ালে ছড়িয়ে দিয়েছে। কি উল্লাস!

পাশের ঘরে রমাইএর মা গুন্‌-গুন্‌ করে গল্প কর্‌চে,—কখনো বা কান্নার চাপা আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। আমি বড় বড় চোখে চেয়েই রইলাম, রাত বুঝি এমনি করেই কাট্‌বে!

হঠাৎ একটা কথা মনে এল। অমিয়ার হাতে আংটিটা পরিয়ে দিলে হয় না? সেই ত বেশ হবে!

পা টিপে-টিপে উঠ্‌লাম। বুকের মধ্যে ধড়াস্‌-ধড়াস্‌ করে উঠ্‌লো? যেন চুরি কর্‌তে চলেচি! প্রদীপটা আড়াল করে সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাড়া নেই, শব্দ নেই।

হাতের উপর আস্তে-আস্তে হাত দিলাম। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। বুকের মধ্যে যেন কে দাপাদাপি করে বেড়াচ্চে! হাতটি তুলে ধরে দেখ্‌লাম অনামিকাতে আংটির দাগ রয়েছে। আংটিটি পরিয়ে দিয়ে—ছুট্‌—ছুট্‌!

নিজের বিছানায় এসে বসে গা দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগ্‌ল। মনে হলো, গ্লানিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে দেহের প্রতি ছিদ্র দিয়ে তা উপ্‌চে বার হচ্ছে।

কে যেন চীৎকার করে বলে গেল—কাপুরুষ—এই তোমার ধর্ম্ম-রক্ষা!

হাতের উপর মাথা দিয়ে ভাব্‌তে চেষ্টা করলাম। মনে হলো মনের চিন্তা-সূত্রগুলো সব জোট খেয়ে গেছে। তাকে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন উপায় নেই।

বুঝ্‌তে পারিনি কখন রমাইএর মা ঘরে এসে ঢুকে প্রদীপটা উস্কে দিয়েছে।

সে বল্লে "বাবা এখনো শোওনি কেন? রাত যে অনেক হয়েছে।"

"ঘুম আস্‌চে না যে।"

দীপের উজ্জ্বল আলোতে দেখ্‌লাম অমিয়া তেমনিই নিস্পন্দভাবে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোলে মেঘলা দিনের শেষ আলোর মত বিদ্রূপের হাসিটুকু লেগে রয়েছে!

বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘুমাবার কত চেষ্টা কর্‌লাম—ঘুম সে'রাত্রে এল না। চুপ করে শুয়ে রমাইএর মার নাকডাকা শুন্‌তে লাগ্‌লাম।

১৭

১০৫ নং সারকুলার রোডে, গেটে প্রকাণ্ড দু'টো সিংহ দেওয়া বাড়ীটাই অমিয়াদের বাড়ী। বাড়ী বল্লে তাকে ছোট করে বলা হয়—সে যেন একটা রাজবাড়ী! তাঁর ঘর-দোর, লোক-লস্কর আসবাব-পত্র আমি কেন, আমার পিতৃ-পুরুষের কেউ দেখেছিলেন বলে ত মনে হয় না।

যা ভয় করেছিলাম তাই, অমিয়ার পিতা সে-যাত্রা রক্ষা পান নি। বিষয়-আশয় সব এক্‌সিকিউটারের হাতে। তাঁরা অমিয়ার কোন খবর না পেয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের গাড়ীখানা যখন গাড়ী-বারাণ্ডার মধ্যে ঢুক্‌লো, তখন চাকর-বাকরদের মধ্যে যে কি হুড়ো-হুড়ি পড়ে গেল, তা আর কি বল্‌ব! কে কোথায় ছুটে যাবে তা যেন ভেবেই পায় না!

অমিয়া ত তিন-দিন বিছানা থেকে উঠ্‌ল না। নিমাই বাবু ঘন-ঘন আনাগোনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমাকে সবিশেষ অনুরোধ করলেন, দিন কয়েক থেকে যেতে। সে অনুরোধ এড়ান যায় না। কাজেই থাক্‌তে হলো।

মানুষের মনটা যে কি অদ্ভুত উপ'করণে তৈরি, তা' বলা যায় না। যত বড় অস্ত্রই কেন কর না, ভিতর থেকে মাংস গজিয়ে ক্ষত-পূরণ কর্‌তে বড় বেশী দেরী লাগে না। চার দিনের দিন অমিয়া ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। অমাবস্যার পর শুক্লা তৃতীয়ার শশিকলার মত সে এই ক'দিনে ক্ষীণ হয়ে গেছে!

বেলা আটটা ন'টা হবে। সে আমার ঘরে এসে একখানা গদি-

মোড়া চেয়ার টেনে কাছে বস্‌লো। প্রথমটা কথা কইতে পার্‌লে না— চোক দিয়ে বড় বড় ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করে পড়তে লাগ্‌লো।

আমি চোখের জল দেখ্‌তে ভালবাসি—ও যেন শোকে শরতের শেষ বর্ষণ। চোখের জল দেখ্‌লেই মনে হয়—এবার ধুয়ে-পুঁচে মনের আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠ্‌বে।

এই তিন দিনের অসাক্ষাতে আমি যেন অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি। কথা কইতে বাধ-বাধ ঠেক্‌ল—চুপ করে বসে-বসে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

কপালের উপর ভাঙ্গা-চুলগুলো গোছা বেঁধে ঝুলে আছে; মুখখানা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে,—সরস্বতীর গ্রীষ্মের ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারাটির মত।

কাল চোখ দুটো হরিণের মত, হাস্য-কৌতুকের সমস্ত লীলা-বিবর্জ্জিত; বিষাদের নিবিড়তায় স্নিগ্ধ, করুণ, প্রশান্ত; একবার আমার মুখের উপর ফেলেই নামিয়ে নিয়ে মাটির উপর রাখ্‌লে। কথা কইতে গিয়ে গলার শব্দ বার হলো না। গাল দুটার উপর ঝক্‌ ঝক্‌ করে লাল রং এসে পড়তে লাগ্‌ল! আবার দু'চোখ জলে ভরে গেল!

এমনি বারকয়েক চেষ্টা করে অমিয়া কথা কইতে পার্‌লে।

প্রথম কথা, "তুমি চলে যেও না।"

বল্লাম—"যাইনি ত।"

পায়ের উপর পা রেখে মাথাটা কোলের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে নখ খুঁটতে লাগ্‌ল।

বল্লে, "আমার কেউ নেই যে।"

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। এমন কতক্ষণ কেটে গেল।

অমিয়া বল্লে, "এ আমার নতুন নয়,—এসে এই যে দেখ্‌তে হবে তা

আমার মন অনেকদিন আগেই জানে। কত শক্ত করলুম তাকে; কিন্তু সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে!"

সান্ত্বনার কথা কি বলতে হয় তা' আমার মনে এলো না। আমার সমস্ত হৃদয়টা নিগূঢ় ব্যথায় মথিত হয়ে উঠছিল; ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বার হলো না।

"এই অবস্থায় আমাকে ফেলে চলে যাবে না, তা জানি; তবু ভয় হলো—তাই ছুটে বলতে এলুম।"

বল্লাম, "হুঁ।"

সে বল্লে, "এই বাড়ী, এই ঘর, লোকজন সবই তোমার—এতে তুমি কিছুতেই না বলতে পারবে না। যদি তুমি না থাক, ত আমিও থাকতে পারবো না।"

এ অবস্থায় তর্ক করা বৃথা। আমি চুপ করে রইলাম।

অমিয়া হাত জোড় করে বল্লে, "লক্ষ্মীটি আমার, এই কথা আমার রাখ।"

তার এই প্রচণ্ড আঘাতের উপর আবার আঘাত দিতে মন সরল না। বল্লাম, "তাঁর ইচ্ছা যদি তাই হয়—তা হ'লে তা' মাথা পেতে নিতে হবে,—তাকে আমার ক্ষুদ্র শক্তি রোধ ক'রতে পারবে না অমিয়া!"

সে যেন একটু আশ্বস্ত হলো; চোখ দুটো একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

অমিয়া আমার হাতখানা ধরে বল্লে, "আমি জানতুম তুমি না বলতে পারবে না—তা কি পার?—তা কি পারা যায় কখনো?"

কি তোমায় বলব অমিয়া! তুমি জান! কেমন করে জেনেচ তুমি আমার মনের নিভৃততম কথা—সে যে আমিই জানিনে!

আমি বল্লাম, "রমাইএর মাকে আন্‌লে বেশ হতো—তোমার একজন সঙ্গী হতো।"

"কেমন করে সে আসে! আস্‌বে—তাকে আস্‌তে বলে এসেচি—আবার লোকও পাঠাব; কিন্তু সে ত আজ-কালের মধ্যে নয়—কিছু-দিন যাক্!"

আমার মনে মুক্তির বাতাস বইছিল, তাই এই বন্ধনের প্রসঙ্গগুলো কেমন বেথাপ্পা বলে ঠেকল। এর আগে যে কথা জোর করে বলে এসেছি—এখন আর তা বলা চলে না, অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে পড়ে। এদিকে চুপ করে থাক্‌লেও যেন একটা সম্মতির মত শুনায় কি করি এখন!

অমিয়ার হাতের মধ্যে থেকে নিজের হাতখানা আস্তে আস্তে তার অলক্ষ্যে টেনে নিতে গেলুম—সে ম্লান হাসি হেসে বল্লে, "তা হবে না, তুমি কথা দাও আগে।"

বল্লাম, "মানুষের কথার কি ঠিক আছে অমিয়া,—কথা আমি দিলেও—তাঁর ইচ্ছে হলে এক পলকে কেথায় উড়িয়ে দিতে পারেন।"

"সে আমি জানি; কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা কি—বল্‌তে পারো না? একবার আমার দিকে তাকাও—দয়া হয় না? ধন্য তোমার কঠিন মন।"

আমি মাথা নীচু করে এই তিরস্কার গ্রহণ কর্‌লুম—উপায় কি? মনের কথা খুলে বল্‌বার নির্দ্দয়তা আমার জুট্‌ল না।

অমিয়া হাত ছেড়ে দিয়ে একটু বেঁকে বস্‌ল, "এ আমি খুব জানি যে, তোমাকে ছেড়ে না দিলে তুমি যেতে পার্‌বে না।"

তখন মনে হলো হয় ত বা সত্যই পারিনে। আমার মনের উপর অমিয়ার হাতখানা যেন চেপে রয়েছে! শিশুকে যেমন আবদ্ধ করলে

তার সমস্ত হৃদয়টা কান্নায় ভরে উঠে আকুল করে দেয়—তেমনি করে আমায় মনটা কেঁদে উঠ্‌ল। এ কিসের জন্যে কান্না! মুক্তির জন্যে মানুষের আত্মা ত' এমনি করে চিরদিন কাঁদ্‌চে!

একটা জুলুম হচ্চে—তা যেন সে আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লে। ফিরে তার চোখ দুটো আমার মুখের উপর প্রদীপ্ত করে দিয়ে বল্লে, "আমার উপরোধ-অনুরোধেরও অন্ত নেই; কিন্তু এও আমি জানি যে, তুমি যেটি ভাল বোঝ, তা থেকে এক তিল নড় না। তার দৃষ্টান্ত এই আমার সঙ্গেই রয়েছে" বলে সেই আংটিটা দেখালে।

আংটিটা আমি বাঁ হাতে পরিয়ে দিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম সেটাকে ডান হাতে। বল্লাম, "হাত বদলেচ যে?"

"ও কি আর বাঁ হাতে রাখা যায়? ও যে এখন আমার মাথার মাণিক।"

কথাটা এমন অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে বল্লে যে, আর কোন প্রশ্নই তার বিষয়ে করা চলে না।

চাকর এসে খবর দিলে নিমাইবাবু এসেছেন। অমিয়া বসে বসে কি একটা ভাব্‌লে; ভেবে বল্লে, "দেখ, আজ রাতে একটু আমার জন্যে জেগে অপেক্ষা করো; আমার কয়েকটা বল্‌বার বিশেষ কথা আছে।"

আমি বল্লাম, "আচ্ছা!"

অমিয়া চাকরের দিকে ফিরে বল্লে, "নিয়ে আয় না বাবুকে এইখেনেই ডেকে।"

নিমাইবাবু এলেন। ইনি অমিয়ার বাবা রমেশবাবুর বাল্যবন্ধু—এখন একজন নামজাদা উকীল।

তিনি আমাকে দেখেই বল্লেন—"আপনার এখন কিছুদিন থাকা হচ্চে ত?"

অমিয়া বল্লে, "কাকা আপনি ওঁকে আপনি-আপনি কর্‌বেন না ; 'তুমি' বলুন না।"

"আমার মা, কেমন বদ্‌ অভ্যাস—বাইরের লোক হলে কেমন বেরিয়ে যায়।"

"আপনি ওঁকে বাইরের লোক বলে মনে কর্‌বেন না কাকা।—ওঁর চেয়ে নিকট আমার আর কে আছেন ? সব ত বলেছি আমি—নিজের জীবনকে জীবন মনে করেন নি।"

আমি নির্ব্বাক্ হয়ে মাথা হেঁট করে রইলাম। অমিয়া দেখ্‌লাম ঠোঁট টিপে তার মৃদু হাস্য চাপ্‌তে চেষ্টা কর্‌চে।

ভাল মন্দ এদিক-ওদিক কত কথা বলে নিমাই বাবু চলে গেলেন। অমিয়া উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "তবে ঠিক্ রইল সেই কথা—আজ সন্ধ্যার পর থেকে আমার প্রতীক্ষায় থেকো। আমার ফুরসৎ হলেই আমি আস্‌ব।"

"তোমার এত কাজ কিসের ?"

"আজ যে চতুর্থী কর্‌চি। ব্রাহ্মণভোজন হবে ; কয়েকটি মেয়ে নিমন্ত্রণ করেছি।"

"তা হলে আজ ত আমার তোমাদের বাড়ী থাক্‌তেও নেই, খেতেও নেই।"

"কেন ?"

"গুরুর মানা, শ্রাদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখ্‌তে নেই যে।"

"আচ্ছা—কাজ নেই তবে দেখে,—তুমি আজ আমাদের রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে যাও। সন্ধ্যের পর কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাকে আনিয়ে নেবো।"

গাড়ী করে আমি সেই সকালে গোবিন্দজীর মন্দিরে চলে গেলাম।

২০

বাড়ী ফিরে এলাম, তখন অনেক রাত হয়েছে,—দশটা কি এগারটাই হবে। সন্ধ্যার সময় খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল; এখন পরিষ্কার আকাশ; চাঁদ ডুবে গেছে—নক্ষত্রগুলো ঝক্‌ঝক্ করচে।

নিস্তব্ধ বাড়ীতে গাড়ীখানা এসে লাগ্‌ল—বারাণ্ডার সিঁড়ির উপর অমিয়া দাঁড়িয়ে—পরণে একখানি গোলাপী সিল্কের শাড়ী—গায়ে এক-গা গয়না। তাকে দেখেই চোখ যেন ঝল্‌সে গেল। বল্লাম, "ইস্, এত সাজগোজ কেন?"

সে বল্লে, "মেয়েদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম কি না—মেয়েরা গয়না দেখ্‌তে আর দেখাতে খুব ভালবাসে—তাই এই সাজগোজ। তোমার আপত্তি থাকে ত খুলে ফেলি।"

"না আমার আপত্তি কিসের—বেশ দেখাচ্চে তোমাকে।"

সে বল্লে, "বাঁচলুম—তুমিও তা হলে সাজ-পোষাক গয়না-গাঁটি ভাল বাস?"

কথা বল্‌তে-বল্‌তে আমরা বড় সিঁড়ি পার হয়ে দোতলার দালানে এসে পৌছলাম। বাঁ-হাতি আমার ঘর। সেদিকে ফিরতেই অমিয়া পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বল্লে—"ও-দিকে নয়, এই-দিকে এস," বলে তেতালার সিঁড়ির দিকে চল্‌ল। আমি পিছনে-পিছনে চল্লাম।

সে বল্লে, "আজ আর নীচের তলায় কাজ নেই,—কি জানি, ছোঁয়া-লেতায় যদি তোমার সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হয়; তাই একেবারে তোমার ব্যবস্থা তেতলায় করে রেখেছি।"

প্রায় সমস্ত বাড়ী জুড়ে তেতলার হলটা। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লাম আলোয় আলো ;—ফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত।

"ব্যাপার কি ?"

"কিছুই না—এটা তোমার তপোবনের মত করে সাজিয়ে রেখেচি। লোকজন কেউ এখানে আস্‌তে পার্‌বে না।"

বল্লাম, "সে বেশ হবে—খুব ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে আজ।"

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি চারিদিকে ফুলের টব দিয়ে সাজান,—মধ্যে দুটো প্রকাণ্ড পালং—সাদা ফুল দিয়ে মোড়া। মেজের উপর দুখানা আসন পাতা—একটার সাম্‌নে অশেষ-বিধ চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয়। আর একটা খালি।

অমিয়া আমার হাত ধরে সেই আসনের উপর বসিয়ে বল্লে, "খাবে বস —কত দেরি হয়ে গেছে—কত না ক্ষিদে পেয়েছে—আমার সন্ন্যাসীর।"

বল্লাম, "ঠিক সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বন্দোবস্তগুলিই হয়ে রয়েছে দেখ্‌ছি। ব্যাপার কি খুলে বল ত।"

"বলচি—তুমি খেয়ে নাও ত, সব বলব—আজ আর কোন কথার শেষ থাক্‌বে না।"

খাওয়া শেষ হলে অমিয়া বল্লে, "একটু বিশ্রাম করগে ঐ খাটে—আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি—একটু খেয়ে নি।"

"কেন ? এত রাত পর্য্যন্ত না খেয়ে আছ কেন ?"

"তোমায় না খাইয়ে খাই কি করে ? তুমি যে অতিথি—নারায়ণ।"

"যাও যাও খেয়ে এস গে।"

"যাব আবার কোথায় ?—আজ আমার তোমার পাতেই খেতে হয়

যে।" বলে সে খালি আসনটার সাম্নে আমার থালাখানা টেনে নিয়ে বসে গেল।

আমি বেরিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে পায়চারি কর্তে লাগ্লাম।

পাগ্লী আজ আবার একটা কি ঘটাবে দেখ্চি। এত খেয়ালও মাথায় আসে!

খাওয়া শেষ করে, সে আমায় ডেকে বল্লে, "চল একটু তপোবনের বেদিতে বসিগে।"

আমি ঘরে ঢুক্তে-ঢুক্তে বল্লাম—"তোমার চতুর্থী ত হয় না—তুমি যে এখনো সগোত্র রয়েছ।"

"না, গোত্র ত বদ্লে গেছে সেদিন। বুঝতে পার্চ না?—আজ যে আমার ফুলশয্যা—তারি এ সব ধুম-ধাম।"

"ফুলশয্যা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, অমন আকাশ থেকে পড়লে চল্বে না—চল একটু বসে কথা কইগে। অনেকদিন, সেই ষ্টীমারে বসে যেমন করে কথা কইতাম—কওয়া হয়নি।"

অমিয়ার ফুলশয্যায় তার সন্ন্যাসী বন্ধুটি ঠিক চোরের মত গিয়ে বস্ল।

দুজনে পাশাপাশি বস্লাম। সাম্নে দেওয়ালে একদিকে অমিয়ার মার ছবি, আর একদিকে রমেশবাবুর। মনে হলো দুটি মুখ হর্ষ-বিকচ। আমরা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলাম।

"এ কি পাগলামি তোমার?"

"অপরাধ করেচি?"

"অপরাধ নয় ত কি? ব্রহ্মচারীর মনকে এমন করে মুগ্ধ করা কি উচিত তোমার?"

'আমি ত ব্রহ্মচারী নই—আমার মত উদ্যোগ আমি করলাম, এখন তোমার পালা,—এবার একটি-একটি করে ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দাও আমার সকল মোহ।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"তোমার পায়ে কত শত অপরাধ করেছি—সবই ত মার্জ্জনা করেছ—আজকেও মার্জ্জনা কর।"

রজনীগন্ধার তীব্র গন্ধে আমার মনের মধ্যে যেন মাদকতা নিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

একটা ফুল তুলে নিয়ে বল্লাম, "এই ফুল-গুলোকে আমি দু-চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।"

"কেন?"

"এ বেশ-ভূষায় বিধবা, কিন্তু মনে মাতাল।"

"তবে কোন্ ফুল তুমি ভালবাস?"

"যূঁই।—ছোট ফুলটি, মিষ্টি ব্যথার মত স্নিগ্ধ তার গন্ধ।"

একটা যূঁইয়ের গোড়ে তুলে নিয়ে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে অমিয়া বল্লে, "রাগ আজ কর্‌তে নেই—রাগ করো না।"

আমি বল্লাম, "হাস্‌তে আছে ত?—কি জানি কি আছে-নেই তা আমি ত জানিনে—বলে-বলে দিও আমাকে, নইলে ভুল চুক হবে।"

"ভুল হলেও তোমার দোষ নেই—তুমি যে আমার সন্ন্যাসী বর। আজ দেখ্‌তে চাই কেমন করে আমাকে পায়ে ঠেল।"

"বেশ,—তাহলে আজ আমার পরীক্ষার দিন!"

মনে-মনে বল্লাম, হে ভগবান, কত পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তুমি

নিয়ে যাও মানুষকে! আজকের এই কঠিন পরীক্ষায় তুমিই ফেলেচ,—তুমিই উত্তীর্ণ করে দেবে।

অমিয়া আমার হুটো হাত তার হু'হাত দিয়ে চেপে ধরে বল্লে, "মিথ্যে কথা একটিও আজ বল্‌তে নেই—বল মিথ্যে ... না তুমি?"

আমি হাস্‌তে লাগ্‌লাম—বল্লাম, "মিথ্যে তোমায় বলিনি কোন দিন অমিয়া,—তবে সব কথা যে বলা যায় না।"

"আজকে সব বল্‌তে হবে।"

"কি হবে সে-কথা শুনে, যাতে বিশ্বের কোন লাভ নেই?"

"বিশ্ব কি কেবল লাভের সন্ধানেই ফিরচে? সে কি হুটো বেশী কথা শুন্‌তে লালায়িত নয়?"

"যা অতিরিক্ত, তার স্থান নেই এ জগতে।"

"বিশ্বাস করিনে ও-কথায় তোমার।"

"সে তোমার ইচ্ছা।"

"বল, সত্যি কথা বল, যা এতদিন বলনি, যা শুনে বিশ্বের কোন লাভ হবে না—সেই কথাটাই আজকে তুমি বার-বার করে বল।"

কি চায় শুন্‌তে এই বিজয়িনী নারী! কেমন করে সে লজ্জার কথা—আমার পরাজয়ের কথা তাকে বল্‌ব?

"কি হবে তোমার শুনে সে কথা?"

"তৃপ্তি।"

"যদি তৃপ্তি না পাও?"

"তাতে হুঃখ কি? তৃপ্তি কি চাইলেই পাওয়া যায়?"

চুপ করে চোখ বুজে বসে রইলাম—মনে-মনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম

অমিয়ার চোখ দুটো আশা-আকাঙ্ক্ষার বেদনায় যেন আমার দিকেই বিস্ফারিত হ'য়ে রয়েচে।

মনে কোন উদ্বেগ এল না—শান্ত-গম্ভীর স্বরেই বল্লাম, "তোমার অনুমান সত্য অমিয়া,—আমি তোমায় ভালবাসি।"

"এই ?. সে কথা ত' অনেক দিন আগেই জেনেচি।"

"আর কি শুন্‌তে চাও ?"

"কি দিতে চাও আমাকে এই ভালবেসে।"

"দিতেই হবে ? আমি রিক্ত—আমার যে কিছুই নেই ত্রি-সংসারে।"

"যার কিছু নেই দেবার—সে ত নিজেকে দেয়।"

"তাও যে অনেক আগে নিবেদিত হয়ে গেছে—নির্ম্মাল্যে তোমার কাজ হবে না।"

"তবে আর কিছু আমি চাইনে। এই আমার ঢের।—আমিও তোমাকে সব দিলাম—আমার যা আছে ক্ষুদ-কুঁড়ো।"

"কি কর্‌ব আমি তা' নিয়ে ?"

"গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও ; তোমার যা অভিরুচি।"

নিস্তব্ধ নিশীথে জীবন-নদীর চরে এই হংস-মিথুন কি চায়, তা জানে না! এই না-জানাই কি অনন্ত-প্রেম ?

হৃদয়টা ব্যথার একটা মৃদু-মধুর পীড়নে যেন মগ্ন হয়ে গেল।

অমিয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে বল্লাম—"এই ভালবাসা ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান অমিয়া!—একে হৃদয়ের নিভৃতে চির-পবিত্র রাখ্‌তে চাই—ভগবান করুন এতে যেন সংসারের আবিলতা না আসে।"

"তাই যদি তোমার ইচ্ছা—আমি তাতে বাধা দেবার কে ?"

তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

"কিন্তু অমিয়া, তুমি কেন এই ব্রত গ্রহণ করবে ?"

"কেন ?—আমার দেবতা কিসে তোমার দেবতার চেয়ে খাটো ?—আমার নির্ম্মাল্যও যে আর কোন পূজায় লাগ্‌বে না।"

এমনি করে নীরবে বাসর-রজনী কেটে গেল। দুটি স্বচ্ছ হৃদয়ের কলধ্বনি নিঃশব্দ-ঐকাগ্রতায় সে রাত্রে দুজনে শুনে নিলাম। সে শুনার আজও শেষ হয় নি। জন্ম-জন্মান্তরে হবে কি না কে জানে!

ভোরের আলোতে ঘরের দীপগুলি ম্লান হয়ে এলো। অমিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতে তার আংটিটা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে বল্লে, "অপরাধ নিও না—আজ থেকে তুমি ছাড়া পেলে। বনের হরিণ ঘরে থাকতে পারে কি? তাকে মনের বাঁধনে যে বাঁধ্‌তে পেরেছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য!"

আমি তাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে সমস্ত মুখ চুম্বনে-চুম্বনে ভরে দিলাম। লজ্জায় সে রাঙা হয়ে গেল।

* * * *

তার পর?

তারপর আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম; এসে বাড়ীর প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম। সকালের বাতাস আমার অঙ্গে-অঙ্গে হাজার চুম্বন দিয়ে চলে গেল। আকাশে তখনো ঘোর কাটেনি—মনে হলো ঘুমের ঘোর তা'তেও লেগে রয়েছে। রাস্তায় এসে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লাম—বারাণ্ডার উপর অমিয়া দাঁড়িয়ে আছে—চক্ষে তার অশ্রু—মুখে তার হাসি!

মনটা জাহাজের নিশানের মত তার দিকেই ফিরে রইল! মনের কম্পাসের কাঁটা কিন্তু সাম্‌নে দেখিয়ে বল্লে—

"আগে চল্‌!"

সমাপ্ত